প্রথম প্রকাশ : ৫ই আগস্ট ১৯৭১



প্রকাশনায় : হামিদুল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস ৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। মুদ্রণে : এমডি. এম. খান, দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১।

ছোট কাকা শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশশর্মাকে

সবিনয় নিবেদন

যাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা এ-বই প্রকাশের কাজকে সুসম্পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে তাঁরা হলেন অয়ন-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশংকর চক্রবর্তী, শ্রীসুবিমল ভট্টাচার্য, শ্রীচঞ্চল মুন্সী, শ্রীমতী জয়া বর্মন, শ্রীমতী কল্যাণী বর্মন ও শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত। এঁদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আর ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজে যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

চেষ্টা করেও দু-চারটে ছাপার ভুল এড়ানো গেল না। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

গোপাল অতি সুবোধ বালক

একক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ নাটক

ক

[মঞ্চের একেবারে বাঁদিকে একটি টেবিল এবং তার দুপাশে দুটি চেয়ার। টেবিলের ওপর টেবিল-ল্যাম্প। এছাড়া আছে একটি বইয়ের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও দোয়াত-কলম। টেবিলের পাশে টেলিফোন।

চেয়ার-টেবিলের ডানদিকে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা একটি ইজিচেয়ার। তার একপাশে একটি বেড্‌সাইড্‌ ল্যাম্প, আর একপাশে উঁচু গোলটেবিল। তাতে মদের বোতল ও গ্লাস, একখানা

বই, দামী সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই আর এ্যাসট্রে।

আরো ডানদিকে একটি আসনের সামনে ফুলতোলা ঢাকনায় ঢাকা একটি জলচৌকি। তার ওপর রুপোর স্ট্যাণ্ডে আয়না ও রুপো দিয়ে বাঁধানো চিরুনি।

জলচৌকির পাশে আর একটি পড়ার ডেস্ক। তার ওপর এক কপি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'। পাশে দোয়াত-কলম। এই সব জিনিসগুলো এমন হওয়া দরকার যাতে উনবিংশ শতাব্দীর অবস্থাপন্ন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের আবহাওয়া খানিকটা গড়ে ওঠে।

গোপাল জলচৌকির কাছে বসে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে খুব মনোযোগের সঙ্গে চুল আঁচড়াচ্ছে আর গুন গুন করে গান করছে। হঠাৎ দর্শকদের দিকে চেয়ে একগাল হেসে]

আমার নাম গোপাল। আমি আপনাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত কিন্তু মাঝে মাঝে কেহ কেহ এমন ভাব করেন যেন কস্মিনকালেও আমাকে দেখেন নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, কোত্থেকে এলে বাপ গোপাল? আমি তখন রবিঠাকুর হইতে কোট্ করিয়া বলি :

'মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।'

আমি তো ইচ্ছা হইয়া ছিলাম আপনাদের সকলের মনের মাঝারে। কখনো বাহিরে আসি, আলাদা হই, যেন দর্পণে আপনাদেরই স্বমূর্তি দর্শাইতে সাহায্য করি। সাদা বাংলায়, গোপালরূপ ধারণ করি।

[আবার চুলে মনোযোগ দিল। এবার গানের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে : 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়।' কিছুক্ষণ বাদে আবার দর্শকদের দিকে চেয়ে।]

দেখি চুলটাকে ম্যানেজ করিয়া মুখশ্রীতে একটি গোপাল-গোপাল ভাব আনা যায় কিনা।

[অনেক চেষ্টায় যেন গোপাল-গোপাল ভাব আনা গেছে এমনি তৃপ্ত ভঙ্গিতে শেষবারের মত আয়নায় মুখ দেখে, দুহাতে চুলটা চেপেচুপে, গোঁফ মুচড়ে আয়না পাশে সরিয়ে রাখল।]

এবার লেখাপড়া করিব। লেখাপড়া করে যে-ই, গাড়িঘোড়া চড়ে সে-ই

[উঠে গিয়ে পড়ার ডেস্কের সামনে বসল। 'বর্ণ-পরিচয়' তুলে ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাল তারপর ভাবগম্ভীর সুরে।]

ইহা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ। পড়ি।

[পড়ার ভঙ্গিতে]

গোপাল অতি সুবোধ বালক।

[পড়া থামিয়ে]

দেখিলেন তো, আমার ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের প্রথম লাইন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন। নামটি সাধারণ বটে কিন্তু নামকরণ করিয়াছিলেন অসাধারণ ব্যক্তি এবং আজ অবধি সেই সার্টিফিকেটের জোরে দিব্যি চলিতেছে।

[হেসে]

একটি ঐতিহাসিক গল্প বলি শুনুন। তখন আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের ভর্তা-কর্তা-বিধাতা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। ১৮৩৫ সন। এই বাংলাদেশের একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে উষালগ্নে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নাম রাখা হইল, গোপাল।

[উলুধ্বনি ও শাঁক বাজে।]

শ্রীমান গোপালের হরস্কোপও লেখা হইল। লিখিলেন এক বিখ্যাত গনৎকার বা শ্রীমানের ধর্মবাপ লর্ড মেকলে। হরস্কোপের নাম, মেকলে মিনিটস্ তিনি লিখিলেন : 'এ্যাট্ প্রেজেন্ট ডু আওয়ার বেস্ট্ টু ফর্ম এ ক্লাস হু মে বি ইন্টারপ্রেটারস্ বিটুইন্ আস্ এ্যাণ্ড দ্য মিলিয়ান্স্ হুম্ উই গভর্ন, এ ক্লাস্ অফ্ পার্সনস্ ইণ্ডিয়ান ইন ব্লাড্ এ্যাণ্ড্ কালার বাট্ ইংলিশ ইন টেস্ট্, ইন্ অপিনিয়নস্, ইন্ মর্যালস্ এ্যাণ্ড্ ইনটেলেক্ট।'

[উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে।]

অনুমতি দেন তো একবার বাংলা করিয়া বলি? আসলে সেই ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের সময় হইতে এতো ইংরাজি বাংলায় তর্জমা করিয়াছি যে ইংরাজি দেখিলেই হাত নিশপিশ করিতে থাকে। অথ মেকলে পিতা উবাচ : ভারতবর্ষে এমন একটি ক্লাস আমাদের গড়িয়া তোলা দরকার যাহারা আমাদের অর্থাৎ কিনা ইংরাজদের এবং যাহাদের আমরা শাসন করি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ

মানুষের মাঝখানে দোভাষীরূপে বা মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবে। তাহারা এমন এক শ্রেণীর লোক হইবে যাহারা মাত্র জন্ম-সুবাদে বা বর্ণে হইবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, নীতি-আদর্শে হইবে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা ইংরাজ। গোপালরা সত্যই একদিন পুরাপুরি ইংরাজ হইবার দুঃস্বপ্নে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, হায়, যদি শেকস্‌পীয়র-মিলটনের দেশে জন্মগ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতাম! সুযোগের আশায় নতজানু হইয়া বলিয়াছিলেন,

[হাঁটু গেড়ে বসল]

ডিরোজিও, মাই ফেণ্ড, ফিলজফার এ্যাণ্ড্ গাইড্, দীক্ষা দেহ, গুরু।

[মাথা নিচু করল। নেপথ্যে ধীর লয়ে চার্চের প্রার্থনা-সংগীতের মত বাজতে থাকে। কিছু সময় বাদে গোপাল আবার স্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে।]

আশা করি, এতক্ষণে আমি বুঝাইতে পারিলাম যে, লর্ড মেকলে আমার ধর্মবাপ আর ডিরোজিও আমার মাস্টারমশায়!

[প্রসঙ্গান্তর]

আচ্ছা, এই যে গোপালের পর গোপাল, পালে পালে গোপাল আসিতেছে, যাইতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে—ইহাদের লইয়া যদি একটি বায়োগ্রাফিকাল প্লে লেখা হয়, তাহার আউটলাইনটা কিরূপ হইবে? আচ্ছা বলিতেছি শুনুন, দরকার হইলে টুকিয়াও লইতে পারেন। এক, বৃটিশ আমলে যেহেতু জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন দেখা দেয় নাই তাই কোনো এক গোপালের একাদশতম পুত্র-সন্তান রূপে আর এক গোপাল জন্মগ্রহণ করিল।—কি করা যাইবে, জন্মের উপর তো কাহারও হাত নাই! দুই, গোপাল যথাসময়ে গ্র্যাজুয়েট হইল।—

—ভবিষ্যৎ কত্তো করনা! তিন, গোপাল প্রেমে পড়িল এবং প্রথম প্রেমের ফর্মুলা অনুসারে ব্যর্থ হইয়া কিছু বিরহের কবিতা লিখিল যাহার একটিও ছাপা হইল না।—চোট-খাওয়া প্রতিভাবানের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান। চার, যথাসময়ে বিবাহের ফুল ফুটিল। প্রচুর নগদ পণ ও যৌতুকসহ গোপাল একটি লজ্জাশীলা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্ম নিপুণা সুলক্ষণা স্ত্রীরত্ন লাভ করিল। আহা, জীবনে আর কি চাহিবার থাকিতে পারে। পাঁচ, গোপাল তাহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নূতন নূতন গোপালের পিতা হইয়া চলিল।—কি করিবে, সবই ভগবানের হাত! ছয়, গোপাল আপিস হইতে ফিরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় এক উকিলের বৈঠকখানায় তাশ-পাশায় নিয়মিত মশগুল হইয়া থাকে এবং ফাঁকে ফাঁকে যে রাজনৈতিক বাগ্মিতার পরিচয় দেয় তাহাতে বাঁচিয়া থাকিলে বিপিন পালও লজ্জা পাইতেন। —সত্যি, কি না হইতে পারিত কিন্তু কিছুই হইল না! সাত, গোপালের পুত্র গোপাল সাবালক হইল। গোপাল যথারীতি পণ-যৌতুক লইয়া তাহার ব্যাটাকে সংসারের ঘানিতে বাঁধিয়া উড়নচণ্ডীপণা ঘুচাইয়া দিল।—হেড্ অফ্ দি ফ্যামিলি বলিয়া কথা! আট, ব্যাটা বিবাহের ছয় মাসের মাথায় তাহার স্ত্রীকে লইয়া কাটিয়া পড়িল।—স্ত্রৈণ কাঁহাকার! নয়, পেনশনের সামান্য টাকা সম্বল করিয়া গোপালের বাপ গোপাল তাহার স্ত্রীকে লইয়া ভাসিল।—এবার পার করো, দীনবন্ধু। দশ, তাহার পর সাইটিকা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িল।—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং! এগারো, যথাসময়ে গোপাল তাহার সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে বিধবা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিল।—বলো হরি, হরি বোল!

[একটু চিন্তা করে]

আমার মনে হয়, গোপালের জীবন-কাহিনীর এই সব সাদামাটা উপাদান লইয়া যদি কেহ একটি বায়োগ্রাফিক্যাল্ প্লে রচনা করেন তো বেশ হয়। নাটকের নাম হইতে পারে, যুগে যুগে গোপাল বা রূপে রূপে গোপাল। অর্থাৎ গোপাল কোথা হইতে আসিল, আসিয়া কি করিল, শেষমেশ কোথায় যাইবে বা যাইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে স্থান-কাল-ঘটনা যে আলাদা আলাদা গোপালের বেলায় আলাদা রকম হইবে তা বলাই বাহুল্য।

[হঠাৎ যেন মাথায় একটা মতলব এল]

ওয়েল, ধরা যাক, টাইম—উনবিংশ শতাব্দী। স্পেস্, কলকাতা।

[গলা তুলে প্রায় চিৎকার করে]

স্টার্ট এ্যাক্‌শন্।

[নেপথ্যে বাইজি বাড়ির গান-বাজনার সুর ভেসে আসে। গোপাল গোল-টেবিলের ওপর থেকে মদের বোতল তুলে নিয়ে গ্লাসে মদ ঢালতে থাকে। তারপর হাতে গ্লাস নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে]

ওয়াইন্ !

'ওয়াইন ইজ্ দ্য ফাউন্টেন্ অফ্ থট্,
দ্য মোর্ উই ড্রিঙ্ক, দ্য মোর উই থিঙ্ক।'

[নেশায় আচ্ছন্ন সুরে]

আমার গ্লাসে পাশ্চাত্য সভ্যতার সুরা! আমি সভ্য হইতে চাহি। 'আই রিড্ ইংলিশ, রাইট্ ইংলিশ, টক্ ইংলিশ, স্পিচিফাই ইন্ ইংলিশ, থিঙ্ক্ ইন্ ইংলিশ, ড্রিম্ ইন্ ইংলিশ।' তবু দ্বিধা কেন কাটে না? কেন আমার মায়ের জন্যে মন কেমন কেমন করে?

'রেখো মা দাসেরে মনে, এ-মিনতি করি পদে।'

আমি দুই নৌকায় পা দিয়া চলিয়াছি। এক পা জন্মভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে, আর এক পা ইউরোপের মাটিতে।

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?'

এখানেই গোপাল চরিত্রের কনট্রাডিক্শান্। সেই কনট্রাডিকশনের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে এক এক ফোঁটা চোখের জল —এক একটি চতুর্দশপদী কবিতা।

[গোপাল বিষন্ন ভঙ্গিতে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। নেপথ্যে একটি চতুর্দশপদী কবিতা আবৃত্তি হতে থাকে :
'নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে,
যদিও অধমপুত্র মা কি ভুলে তারে?'
গোপাল আবার যখন ফিরে এলো তখন তাকে জাতীয় কংগ্রেসের গোড়ার দিককার উচ্চ মধ্যবিত্ত নেতার মত দেখাচ্ছিল কিন্তু কথাবার্তা স্বাভাবিক।]

দেখতে দেখতে গোপাল একদিন সাবালক হলো। সে এখন তার নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে। রাজনীতি নিয়েও অল্পবিস্তর মাথা ঘামায়। সে মডারেট্‌লি চেষ্টা করলো যাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা ভদ্রলোকের চুক্তিতে আসা যায়। যাতে বিশেষভাবে তার ক্লাসকে কিছু সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়। তাই নিয়ে মডারেটর গোপালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দেশের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠলো।

[বিশাল জনসভা শুরু হবার আগে যেমন গোলমাল শোনা যায়, নেপথ্যে কিছুক্ষণ তেমনি গোলমাল। গোপাল জনসভায় বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলা বলার অনভ্যাসহেতু তার বাচনভঙ্গি যেন খানিকটা আড়ষ্ট।]

মাই ফ্রেণ্ডস্ এ্যাণ্ড্ কান্ট্রিমেন্, আপনারা জানেন, এ-দেশের বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে গোড়ার দিকে আমাদের কোনো রকম মতবিরোধ ছিল না। থাকবেই বা কেন। তারা আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে, মুখে ভাষা দিয়েছে, মনে জুগিয়েছে আত্মবিশ্বাস। তাই তাদেরও আমাদের লয়্যালটি, আই মিন, আনুগত্যে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ এতাবৎকাল ঘটেনি। আমরা গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটা ভদ্র-লোকের চুক্তি চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, এডুকেশন, গভর্নমেণ্ট সার্ভিস, সেল্ফ্ গভর্নমেণ্ট, আই মিন, স্বায়ত্তশাসনে আমাদেরও কিছু কিছু সুযোগ দিতে হবে। না দিলে এজিটেশন হবে, মুভমেণ্ট হবে।

[ঘনঘন হাততালি]

আমাদের দাবী, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা হবে বিলেতের বদলে ভারতে। আমাদের দাবী, পরীক্ষার্থীর বয়স উনিশ থেকে বাড়িয়ে একুশ করতে হবে। তা না হলে ইণ্ডিয়ানদের ওপর ভয়ানক ইন্জাস্টিস্ করা হবে। ওঁরা আমাদের সে কথায় কর্ণপাতও করেনি।

[নেপথ্যে শেম্-শেম্ ধ্বনি]

হে আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতে বেশিক্ষণ বক্তৃতা দেবার অভ্যাস এবং সাধ্য আমার নেই, তবু শুধু আপনাদের মুখ চেয়ে, সকলের সমস্যাকে সকলের ভাষায় তুলে

ধরতে চাই বলে আমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বাংলা ভাষায় বক্তব্য পেশ করছি। আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, একটা মাইনর টেক্‌নিক্যাল মিস্‌টেকের অছিলায় ওঁরা আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে বরখাস্ত করেছে।

[আবার নেপথ্যে শেম্‌-শেম্‌ ধ্বনি]

এ শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমার অপমান নয়, এ আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতির অপমান। তাই এ-অবিচারের কাছে কিছুতেই আমরা নতি স্বীকার করতে পারিনা। তাই আপনারাও আমার সঙ্গে বলুন, সারেণ্ডার নট্‌ টু দ্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট!

[নেপথ্যে সমবেতকণ্ঠে : সারেণ্ডার নট্‌ টু দ্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট। এরপর আবার স্বাভাবিক গলায়]

বুঝলেন তো, গোপাল বিপন্ন। জাতীয় মান-মর্যাদার কথা বলে সবাইকে না ডাকলে তার নিজের স্বার্থরক্ষার আর পথ নেই। দেশের মানুষ কিন্তু নির্দ্বিধায় এগিয়েও এলো। আর তখন সে কি মধুর উত্তেজনাময় পরিবেশ! ঠনঠনের পোড়ো বাড়িতে গুপ্তসভা! তরোয়ালের ডগা দিয়ে বুক ফুটো করছি আর রক্ত দিয়ে নাম সই করছি। স্বাধীনতা-যুদ্ধে 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান; তারি লাগি কাড়াকাড়ি।' দেয়াল থেকে ভিঞ্চি-র অয়েল পেন্টিং নামিয়ে দিয়ে ইটালীর মাৎসিনীর ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি। নেতা বললেন, দেশের জন্য তোমার পণ কি? বললাম, পণ জীবন সর্বস্ব। নেতা বললেন, জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। বললাম, আর কি আছে? আর কি দিব? তখন উত্তর হলো, ভক্তি। নেতা ডাক দিলেন, তবে 'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান', আমরা

মিলেমিশে গণেশ পুজো করি। কোনো মুসলমান কাছে ঘেঁষলো না। তাঁদের কিছুতেই বোঝানো গেল না, এ-গণেশ সে-গণেশ নয়। কে কার কথা শোনে। নেতা বললেন, তবে মহারাষ্ট্রের বীর নায়ক শিবাজীকে বরং আমরা জাগিয়ে তুলি। মুসলমানরা আরো খেপে গিয়ে বললেন, ভ্যাট্, শায়েস্তা খাঁর কাটা আঙুলটা ইন্‌ট্যাক্‌ট্ ফেরত দিলেও শিবাজীর সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ হবেনা। এবং হয়ওনি তেমন কম্প্রোমাইজ কোনোদিনই হয়নি। নেতা চেয়েছিলেন, ইসলামপুরের মদন মণ্ডল আর ষষ্ঠীতলার করিম শেখ ভাই-বেরাদারের মতো এক জোট হয়ে এগিয়ে আসুক। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। জোটবাঁধার বদলে ওদের মধ্যে প্রায়ই একচোট ডাণ্ডাবাজি হতো। গভর্নমেণ্ট তখন দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসতো আর নখে নখ বাজিয়ে বলতো, নারদ-নারদ-নারদ-নারদ। বিভেদ আর শাসন, শাসন আর বিভেদ—এ হ'লো তাদের দাবার ঘুঁটি। এদিকে গোদের উপর বিষফোঁড়া। নরম গোপাল যখন পরম ভক্তিভরে বিদেশী দেবতার বন্দনা-গানে মগ্ন তখন পাশে দাঁড়িয়ে চরম অবিশ্বাসী আর এক গোপাল। হঠাৎ সে চিৎকার করে বললো, বন্ধ করো আবেদন-নিবেদন। নরম গোপাল বিরক্ত হ'লো। গরম আরো গলা চড়িয়ে বললো, ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শন্। নরম ভয়ে কেঁপে উঠলো। গরম হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আন্দোলিত করে বললো, ইণ্ডিয়া ফর্ দ্য ইণ্ডিয়ান্‌স্!

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কিছু বিস্ফোরণ ও একটানা গুলি-চালনার শব্দ।]

ভূপেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে সে-ডাক দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। কর্মসাধনার পথে নব শক্তি অর্জন করে যুগান্তর আনতেই হবে। চিঠি পেলো কতো

কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, সূর্য সেনরা। কাম্ সার্প্। মাদার সিরিয়াস্লি ইল্। তখন,

'মা কাঁদিছে পিছে

প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।

ঝড়ের গর্জন মাঝে

বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;

ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;'

[নেপথ্যে ঝড়ের হাওয়া ও সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে।]

সামনে ঝড়ের উত্তাল সমুদ্র। তীর দেখা যাচ্ছেনা! ওরা জানেনা, এ ঝড়ের খেয়া কে তাদের পার করে দেবে! কাণ্ডারী কোথায়?

[নেপথ্যে দৃঢ় কণ্ঠে সুভাষচন্দ্রের আহ্বান শোনা গেল: 'তুম্ হামকো খুন দো, ম্যায় তুম্‌কো আজাদী দেঙ্গী।' সঙ্গে সঙ্গে আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্যারেড মিউজিক—'কদম কদম বড়ায়ে যা' বাজতে থাকে।]

অদম্য আশা নিয়ে তিনি বললেন:

[নেপথ্যে সুভাষচন্দ্রের বাণী:
'আপনারাও মন হইতে সংশয় বিদূরিত করিয়া আমার মত আশা পোষণ করুন। দেখিবেন অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশার অবসানেই উষালোক। উষার দিব্য আলোকে নবীন উদ্ভাসিত। ভারত

নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবে। নিশ্চয়, অচিরেই হইবে।']

ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, মাঝি। ঠিকই বলেছো, অরুণোদয় হয়েছে। সূর্য লাল! কাদের রক্তে এতো লাল! তারা আজ কোথায়?

[নেপথ্যে ক্ষুদিরামের গান 'একবার বিদায় দে মা' ইত্যাদির সুর।]

আমরা খুন দিলুম, আজাদী পেলুম কিন্তু হাত থেকে ভাইয়ের রক্তের দাগ তো মোছা গেলো না। করিম শেখ আর মদন মণ্ডলের রক্তনদীর এপারে-ওপারে আজ পরম নিশ্চিন্তে আমরা বাসা বেঁধেছি।

[ধীরে ধীরে চেয়ার-টেবিলের দিকে যেতে যেতে]

আজ আমি বড়ো ক্লান্ত। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজনীতি নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাই না।

[চেয়ারে বসে]

মনে হয়, অনেক তো করলাম, আর যা বাকি রইলো করবে পোস্ট্ ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্ গোপালরা। আমি আমার জীবনের বাকি কটা দিন এবার আরামে-আয়াসে কাটিয়ে দিতে চাই। তবে একটা কাজ বাকি।

[টেবিল থেকে পাণ্ডুলিপি তুলে]

বায়োগ্রাফিক্যাল প্লে-টা শেষ করে যেতে হবে। নতুন গোপালদের হাতে তুলে দিয়ে যাবো আমার অমূল্য অভিজ্ঞতার উপহার।

[হঠাৎ বাড়ির সদর গেটে ভয়ানক। গোলমাল। যেন অনেক লোকের ভীড়।

[গোপাল এগিয়ে গেল। তারপর দোতলার ঝুল-বারান্দা থেকে নীচে দারোয়ানকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলল :]

গর্জন সিং, নীচে ওয়ে লোগ্ কোন্ হ্যায়? উন্‌হে বাহার নিকাল দো জলদি।

[নীচের থেকে গর্জন সিংয়ের কথা শুনে]

কি বলছে, নেহি যায়গা? শালা যত্তো বড় মুখ নয় তত্তো বড্ডো কথা!

[প্রথমে তুড়ি তারপর হাততালি দিয়ে নীচের কাউকে ডাকার চেষ্টা করে]

এই যে কর্তা, ইউ, তুমি। হাঁ, তোমাকেই বলছি এখানে কি চাই?

[চেঁচিয়ে ওঠে]

আগে বাইরে যাও তারপর অন্য কথা।

[হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে একটু পেছনে সরে আসে]

সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা! তুমি?

[ঢোক গিলে]

তা কি করতে হবে? ইঁদুরের গর্তে লুকোতে হবে? বুঝলে হে, ওসব বিদ্রোহ-টিদ্রোহ ভুলে যাও। জমানা বদলে গেছে।

[আর একজনকে]

আর তুমি কে? তুমি? নীলচাষি? তা সবাই মিলে আমার এখানে চাষ করতে এলে কেন বাপ? তোমাদের কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি?

[এরপর একে একে আর সবার পরিচয় জানতে চায়]

তুমি বোধহয় পাবনার কৃষক-আন্দোলনের কেউ-কেটা হবে ? ঠিকই ধরেছি। আর তুমি ? লায়েক না চোয়াড় ? আচ্ছা। তুমি ? কাকদ্বীপের কৃষক ? দুঃখিত। দেখো, আমার বাড়িতে বা বায়োগ্রাফিক্যাল প্লে-তে তোমাদের জন্যে কোথাও কোনো জায়গা নেই। প্লিজ, গো ব্যাক। এবার আসতে পারো।

[হঠাৎ আরো ভয় পেয়ে]

কি হয়েছে ? জোর করে ঢুকবে ? বলি দেশটা কি মগের রাজত্ব !

[চিৎকার করে]

এই গর্জন সিং, শালাদের পিটিয়ে বার করে দে তো। বলে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। গর্জন সিং, ওপরে উঠে আসছে যে ওরা। না, কিছুতেই ঢুকতে দিবিনা। পেটা, বেধড়ক পেটা। আমি থানায় ফোন করছি। তুই পিটিয়ে যা।

[ছুটে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার ঢুকল। সাবধানে ঝুঁকে নীচের অবস্থা দেখার চেষ্টা করল। তারপর আশ্বস্তভাবে চেয়ারে বসল]

সেরেফ্ প্রভোকেশন ! পেছন থেকে তাতাচ্ছে ! বাড়ি বয়ে ঝগড়া করতে এসেছে তাই। তা আমার এখানে কেন ? রাজনীতি-ফীতি তো অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি আমি। যা করতুম তা সেই দেশ স্বাধীন হবার আগে। এখন প্লেন থিঙ্কিং, হাই লিভিং। চাড্ডি পয়সা চাই। আর কিচ্ছু না। পয়সা এ্যাট্ দি কস্ট্ অফ্ এভ্রিথিং। দয়া-মায়া, নীতি-আদর্শ, বিবেক-মনুষ্যত্ব সব দিয়েও যদি দুটো পয়সা

হয়। তার জন্যে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার মতো অনেকেই তাই। তাই তো দেশটার এতো শ্রীবৃদ্ধি। অমনি হয়।

[হাসে]

এ-দেশ থেকে চলে যাবার আগে সে এক সাহেব আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছ্‌ল, হাউ টু বি এ রিচ্‌ম্যান। বেণের জাত, ওরা শেখাবে না তো কে শেখাবে বলুন। তখন ধরুন, সেকেণ্ড ওয়ার্লড্‌ ওয়ারের লাস্ট্‌ চ্যাপ্টার! দেশটা ভাত দাও, ফ্যান দাও বলে ধুঁকছে। কল-কাত্তাতেও হঠাৎ কটা জাপানী বোমা পড়লো। ব্যস, কলকাতা ফাঁকা! আমার তখন বয়স কম। বিয়ে-সাদি ও করিনি। আমিও পালাবো ভেবে আর পাঁচজনের মত কাছা-কোঁচা খুলে যাবার অবস্থা হয়নি। একদিন শেয়ালদার কাছে একা ঘুর-ঘুর করছি। হঠাৎ এক সাহেবের ট্র্যাপে পড়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি বালক? রাগ হলো। ভাবলাম বলি, আমার নাম দিয়ে তোর দরকারটা কি শুয়োর। তবে শুয়োর-টুয়োর বলিনি। ওরা আবার ওসব খায় তো। খুব ইনডিফারেণ্ট ভাব করে বললাম, আমার নাম গোপাল মেকলে। অবাক হয়ে বললো, কোন্‌ মেকলে? লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে যিনি এদেশে আসিয়াছিলেন? বললাম, ইয়েস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই শ্যালক।—মাইরি, কালীর দিব্যি, এবার শ্যালক বলেছিলাম। ও ভাবলো, আমি বোধহয় ওর নামটা ভুল করছি। বললো, আমার নাম শার্লক নয়, ট্রুম্যান। পরে বুঝে-ছিলাম, লোকটা সত্যি খাঁটি। ট্রুম্যান্‌ আমাকে আদর করে বললো, বাই জোভ্‌, তোমার তো তাহলে বয়স নেহাৎ কম হয়নি? কিন্তু তেমন গ্রোথ্‌ নেই দেখছি। তুমি কি বামন? বললাম, হতে পারি, তবে আপাতত চাঁদে বাসনা নেই, কিছু চাঁদি পেলেই বাঁচি। খুব

খুসি। বললো, টুমি এখানে কি করিটেছে? বললাম, গ্রামে পালাইবার ধান্দা করিতেছে। হঠাৎ খেপে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, হোয়াই? পলাইবে কেন? বাঙালী আদমি বহুট্ কাওয়ার্ড আছে। বললাম, মরতে হয় ইংরেজের হাতে-ভাতে মরবো, জাপানী বোমায় মরবো কোন্ দুঃখে! শুনে শালা এ্যায়সা গ্ল্যাড্ যে থাবড়ে থাবড়ে আমার পিঠ ব্যথা করে দিলো। বললো, গোপাল ইজ্ এ ভেরি গুড বয়। টুমি ক্যালকাটায় বিজ্‌নেস্ করিলে হামি টোমাকে মাচ্ হেল্প্ করিটে পারে। উন্নটি করিবার এইতো চান্স। বললাম, কোন্ বোকার স্বর্গে আছো গো সাহেব? ভারত উদ্ধার করতে মালয়-বার্মার ইণ্ডিয়ান সোলজাররা জাপানীদের পেছন পেছন তেড়ে আসছে, তাদের নেতা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। ভারত স্বাধীন হয় হয় আর তুমি দেখাচ্ছো চান্স? হঠাৎ শালা এতো জোরে হেসে উঠলো, আমি ভাবলাম, রাজাবাজারে আবার বোমা পড়লো বুঝি। সাহেব হেসে বললো, জাপানী কি প্রকারে আসিবে? বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কি বিছানায় শুইয়া শেক্সপীয়রের 'মিড সামার নাইট্স্ ড্রীম্' পড়িটেছে, না এনিমিকে বাধা দানের চেষ্টা করিটেছে? ভারতবর্ষ এবং ভারত-বাসীকে রক্ষা করা বৃটিশ রাজার সুমহান কর্তব্য। আমার চোখে জল এসে গেছ্‌ল। বললাম, তবে যে লোক খেতে পাচ্ছেনা, পরতে পাচ্ছেনা? টম্যান বললো, ইয়েস্, মার্কেটের মাল বিলকুল ওয়ারে চলিয়া যাইটেছে। বললাম, তবে আর বিজনেসটা করবো কি দিয়ে? শালা টম্যান বিলিতি খচ্চরের মতো মিটিমিটি হাসছে জানেন। হঠাৎ মুখটা এগিয়ে এনে বললো, বিজ্‌নেস্ করিবে মানুষের অভাব লইয়া। ইয়েস, অভাব ইজ্ দ্য বেস্ট্ ক্যাপিটাল! তারপর সে কি

হাসি ! আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে বললো, গোপাল, ইউ আর্ টু অনেস্ট টু বি এ বিজ্‌নেসম্যান্ ! যুদ্ধের বাজার। এখন খাদ্য, বস্ত্র, স্ত্রীলোক যাতাতেই হাত দিবে তাতাতেই পয়সা। বলতে বলতে ট্রুম্যান্ ওর কদর্য মুখটা আমার আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে এলো। ট্রুম্যান চোখ মারছে। এক তাল পচা মাংসের মতো ওর কুঞ্চিত মুখটা আমার চোখের সামনে ঝুলছে। ও এতো কাছে এসে কথা বলছিলো, ওর মুখে এতো দুর্গন্ধ, আমার দম আটকে আসছিলো। আমি ওর তলপেটে একটা লাথি মারতে পারতাম। কিন্তু ও যে বড়ো সত্যবাদী ! ও যে ট্রুম্যান্ ! ও আমার জীবনে একটা শক্। লাথি মারা হলো না।

[ক্লান্ত হতাশ সুরে]

এমনি অনেক লাথি-মারার পবিত্র ইচ্ছেকে দমন করেই তো মানুষ সভ্য হয়। সেদিন থেকে আমিও যেন আলাদা মানুষ হয়ে গেলাম। এখনো মাঝে মাঝে সেদিনের কথা মনে পড়লে আপন মনে বলি, ট্রুম্যান সাহেব গো, তোমার কোন্ বাপ-মা এমন সার্থক নাম তোমার রেখেছিলেন। সত্যিই তো, ব্যবসার মতো লাইন আর আছে। এই স্বাধীন ভারতবর্ষে সত্যিকারের স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার যদি কেউ পেয়ে থাকে তো ওই ব্যবসায়ীরা। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-অভাব নিয়ে ব্যবসা করার এমন অবাধ স্বাধীনতা আর কোথায় আছে বলুন।

[হঠাৎ ভেতরের দিকে চেয়ে]

হাঁ, যাই।

[আবার দর্শকদের লক্ষ্য করে]

এসে বলছি পোস্ট্ ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্ মানে স্বাধীন যুগের গোপালের কথা ! মা কি হইয়াছেন।

[উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে যেতে যেতে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে]

ফ্যান্সি ডাকছে, আমার স্ত্রী। আসি।

[প্রস্থান]

বিরতি

৫

[গোপাল ঢুকল। তার পরণে ধুতি ও বুশশার্ট। হাতে ব্যাগ ও ছাতা। সব মিলিয়ে স্কুলের মাস্টারমশাই মনে হচ্ছে।]

তাহলে কি বলবো বলেছিলাম ?—'মা কি হইয়াছেন !' মনে পড়ছে ? দেখুন, সত্যবাদী ট্রুম্যান অবশ্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন, হাউ টু বি এ রিচ্ ম্যান। তা ওঁরা হলেন গিয়ে ক্ষণজন্মা পুরুষ। ওঁদের এ্যাড্ভাইস্ তো আর রাতারাতি ফলো করা যায় না। তাই ব্যবসার লাইনে যাবার আগে স্টপ্-গ্যাপ্ হিসেবে কিছুদিন স্কুল-মাস্টারিও করেছিলাম। সে হলো ফিলার নাম্বার টু !

[একটু থেমে]

প্রথম যেদিন জয়েন করলাম আধবুড়ো হেডমাস্টারমশায় তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

[হেঁটে চেয়ার-টেবিলের কাছে গেল]

বললেন, ব'সো। বসলাম।

[চেয়ারে বসল]

মাস্টারমশায় অনেকটা মুনি-ঋষির পোজ নিয়ে বৈদিক এ্যাক্সেন্টে বললেন, শোনো হে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন তোমাদের হাতে। বললাম, বটেই তো। ইংরেজিতে জোর দিয়ে বললেন, মাইণ্ড্ ছাট্, ইউ আর্ ফাউণ্ডার্ অফ্ দি নেশন্। আমি বললাম, শিওর। তারপর কি বলবো মশায়, একটা নীচু ক্লাসে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ক্লাসে পা দিতেই ফাউণ্ডারের নিজের ফাউণ্ডেশন কেঁপে উঠলো। ওফ্, ভবিষ্যৎ নাগরিকরা কি প্রচণ্ড চেঁচায়।—'স্যর, আমাকে চিমটি কাটছে।' 'স্যর, পেছনে কাটাকুটি খেলছে।' 'স্যর, জামায় কালি ছেটাচ্ছে।' সে কি অবস্থা! কেউ নাকের পোঁটা মুছছে! কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে! কারুর ইজেরের দড়ি খুলে গেছে! কেউ জামার বোতাম ভুল ঘাটে লাগিয়েছে! হাসছে! কাঁদছে! আমি নেশনের ফাউণ্ডার থ! হঠাৎ মনে হলো, জনসেবামূলক কাজে প্রথম ও প্রধান গুণ হলো গলার জোর।

[উঠে দাঁড়িয়ে]

অনুপ্রাণিত হয়ে হাঁক দিলুম, ইউ, গোলমাল করছো কেন? সিট্ ডাউন! খাতা নাও। আমি তোমাদের অঙ্ক কষাবো। লেখো তো, লেখো। সরল সুদকষার অঙ্ক কি রকম শিখেছো দেখি। লেখো।

[ডিক্‌টেশন্‌ দেবার সুরে]

এক মহাজন মাসে শতকরা পাঁচ টাকা সুদ লইলে, পাঁচশত টাকায় দুই বৎসরে সে কতো সুদ পাইবে? হয়েছে? নেক্‌স্ট্‌ এবার একটা মিশ্রণের অঙ্ক। লেখো।

[আবার একই ভঙ্গিতে]

এক গোয়ালা প্রতি সের দুগ্ধ দুই টাকা দরে বিক্রয় করিল। ঐরূপ দশ সের দুগ্ধের সহিত কতো জল মিশাইলে তাহার মোট পাঁচ টাকা লাভ হইবে?

[হাসতে হাসতে পড়িয়ে পড়ে। খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে]

যাদের শেখাচ্ছি তাদের এজ্‌ গ্রুপ্‌ মানে বয়স কতো বলুন তো? এগারো থেকে বারো! স্বাধীন দেশ! ভবিষ্যৎ নাগরিক! আমি নেশনের কারিগার! দেখুন, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বড়ো হয়ে যা যা করা উচিত গোড়া থেকে সব কি রকম অনেস্ট্‌লি শিখিয়ে দিচ্ছি। একেই বোধহয় বলে, লাইফ-সেন্ট্রিক এডুকেশন!

[গোপাল গিয়ে ইজিচেয়ারে বসল। চোখ বুজল। হঠাৎ আবার খাড়া হয়ে বসে]

বিশ্রাম চাই কিন্তু বডি ফেললেই তো মনের বিশ্রাম হয়না। আসলে মাস্টারি আমি ছেড়েছি বটে কিন্তু মাস্টারি তো আমাকে ছাড়েনি। নানা গোঁজামিল-দেওয়া অঙ্ক, যা দিয়ে এতোদিন কাজ চালিয়ে এসেছি, দুদণ্ড চুপচাপ বসে থাকলেই সেগুলো মগজের মধ্যে কিলবিল করে ওঠে। তবে সেই ফর্মুলাটা আমি ভুলিনি, ভুলবোনা।— 'এল্‌ প্লাস্‌ এফ্‌, ইকোল টু দি পাওয়ার ইন্‌ফিনিটি, মাইনাস্‌ এম্‌, ইজ্‌ ইকোয়াল্‌ টু জিরো।'

[হাসতে হাসতে]

কঠিন লাগছে ? মোস্ট ইজি ! এল্-এ লভ, মানে প্রেম-ভালোবাসা; এফ্-এ ফেম, যশ-সুনাম ইত্যাদি। এদের পাওয়ার যদি ইনফিনিটিও হয়, এম্ মাইনস্ হলে অর্থাৎ কিনা, মানি না থাকলে লাইফের ভ্যালু, ইজ্ ইকোয়াল্ টু জিরো,—মানে ঘোড়ার ডিম ! তাই অর্থ চাই। তাই বাণিজ্যের লাইনে আসা। প্রেম আর যশ হলো জীবনের সৌরভ ! টাকার নৈবেদ্যের ওপর চন্দনের ছিটে ! তাই বলি গোপালদের জীবনে প্রেম বলতে ওই তিনটেই- নারীঘটিত, সম্মান-ঘটিত আর অর্থঘটিত ! এর মধ্যে অর্থ শালা সার্কাসের জোকার। ও মদনা একাই একশো। সব খেলা জানে আর ভাব করে যেন ডিগবাজি উল্টে খেতে জানে না। একথা আজ কে না জানে, প্রেম আর যশ, ইন্ দিস্ ওয়ে অর্ ছাট্, ইন্ ক্যাস্ অর্ কাইণ্ড্, ওই অর্থই। তাই আমি বলি, জীবনের গতি সমান সমান থ্রি হর্স পাওয়ার ! আমি জন্মেছি। লেখাপড়া শিখেছি। যথাসময়ে সূত্র মিলিয়ে প্রেমেও পড়েছিলাম।

[হেসে]

বাংলা বাজার, খুড়ি, সুজলা সুফলা বাংলার মাটি প্রেমের এক শাশ্বত লীলাক্ষেত্র, তা তো আপনারা সকলেই জানেন। কতো বিচিত্র প্রেম ! শাক্ত প্রেম ! বৈষ্ণব প্রেম। কোন কোন প্রেমে দেখেছি কামগন্ধ, গায়ের জোর দুইই বেশ উগ্র। আবার কোন প্রেম যেন বিচ্ছেদের অমর গীতিকবিতা। আহা, বড়ো মধুর। আমার জীবনে প্রেম বারবার এসেছিলো সরবে। আমি শাক্ত বলুন আর বৈষ্ণবই বলুন সব রকমই চোখে দেখেছি ! ভালো ! প্রেম মাত্রেই ভালো।

প্রেম এখনো করি, সে অনেকটা ফিল্মের মত মতো। ফিল্মে ভিলেন লাগে। ও রোলটা ছিল আমার বাবার। একদিন বললেন, টেলিফোনের বিল যে মাসে মাসেই বেড়ে যাচ্ছে। মেয়ে বন্ধুদের স'ঙ্গে আলাপচারিটা যেন ডাকযোগে সারে। আর তোমাকেও বলা রইল, আমার টেলিফোন টাচ্ করবেনা।

[হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে]

ওই যে। আচ্ছা ও-ডাক উপেক্ষা করা যায়! বাবারা কেন বোঝেনা, প্রেম জিনিসটা ভয়ানক টাচি, আনটাচড্ ফেলে রাখা যায় না।

[রিসিভার তুলে]

এ-সময় ফোন করে ,আমার মিতালি। আমি ওকে মোটা বলে খেপাই। পড়াশুনোটুনো বিলকুল ছেড়ে দিয়েছে। এখন ভর দুপুরে ভরা পেটে মিষ্টিপান খেয়ে আমার সঙ্গে তার দ্বিপ্রাহরিক প্রেম!

[ফোনে]

হ্যালো মোটা!...কি বললে, তোমাকে মোটা বলার চান্স আর পাবোনা? কেন?

[স্তম্ভিত]

তোমার বিয়ে! দুর্গাপুর!

[উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে]

কোন্ শালার ঘাড়ে কটা গর্দান—আমার পারমিশন্ ছাড়া—। তোমার বাবাই ঠিক করেছেন? করাচ্ছি ঠিক!...কি বললে, এখন তোমাদের বাড়ি যাবোনা? বেশ, যাবোনা!...বাবাকে দুঃখ দিতে চাওনা? বেশ, দিয়োনা।... মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে যাবো দুর্গাপুর?...ছিঃ, কাঁদেনা, তালি। শোনো, আমার কথা শোনো, দুর্গাপুর যাও আর জাহান্নামে যাও, জনমে-মরণে তুমি তো আমারি!

[আবেগে কাঁপা-কাঁপা গলায়]

না, মোটা, তোমার বিয়েতে আমাকে যেতে ব'লোনা। ও প্যাথেটিক্ দৃশ্য—!

[লম্বা দীর্ঘশ্বাস]

তাহলে তুমি বিয়েই করবে না? তোমার এতো স্যাক্রিফাইস্। তবু—

[হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে]

'দূর থেকে তোমায় আমি ভালোবেসে যাবো।'...হাঁ, গান গাইছি, মোটা। তোমাকে ত্যাগের আনন্দ!.. হাসিমুখে তোমাকে বিদায় দেবো? বেশ, তাই দেবো!...এই তো হাসছি, এই যে, শোনো, হা-হা-হা!

[ফোন রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠে দাঁড়াল]

মোটা নেই! ভালোবাসা নেই!

[দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবৃত্তি করে]

'পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
পাইনু বরজ তাপে।'

তারপর থেকে আমার ঘন ঘন কবিতা আসে। কবিতা লিখি।

[লেখার টেবিলে গিয়ে বসে। ভাবে তারপর লিখতে লিখতে পড়ে।]

'কি মিনতি রেখে গেলে প্রিয়া,
তোমারে পাবার অগ্নিদীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি।'

[হঠাৎ থেমে গিয়ে]

কি হলো? রবীন্দ্রনাথ এসে যাচ্ছে, না?

[খেপে গিয়ে]

ওই একখানা বাক্তি! সুখে-দুঃখে একটা কলম কিছু লেখার উপায় নেই, অমনি নাক বাড়িয়ে বলবেন, টুকলে বাবা? তা একটু স্মার্ট্লি টোকো, না-হয় অন্তত কোটেশন-মার্ক্টা দাও।

[লেখা কেটে দিয়ে]

কাটো রবীন্দ্রনাথ! ছঃ! উনি ছাড়া যেন লেখা যায়না!

[আবার খানিক লেখে তারপর পড়ে]

'মাভৈঃ মাভৈঃ! বুক জুড়ে আজ প্রলয় যেন ঘনিয়ে আসে।'

[হঠাৎ থেমে কলম কামড়ে ধরে তারপর

[লম্বা লম্বা টানে লেখাটা কাটে।]

প্রলয় নয় রে স্টুপিড্, নজরুল—নজরুল ঘনিয়ে আসছে। নিজের প্রেম, নিজে কিছু ছাড়্।

[উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায়]

তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ডালি। কবিতা আমাকে দিয়ে হলোনা। কিন্তু আমারো তো একটা কিছু ত্যাগ করা দরকার। ঠিক আছে, আমি বরং পরিবেশন করবো, পাতে পাতে লেডিকেনি দেবো—আমার টোকেন ত্যাগ! এ রকম ব্যাপারে তো আমরা কমবেশি সকলেই ভুক্তভোগী, বলুন? একটা মেজর ইমোশন্যাল্ ফ্রাক্চার। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। চেক-আপ্ করে বললেন, টাইম্লি এসেছেন। ভয়ের কারণ নেই। আসলে র‍্যাশনাল ব্যাক্বোনে সিক্রিশন্ কম হলে এমন হয়। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে একেই বলে, গোপালিয়ান্ ক্যালাসি। এ হেন অবস্থায় জানেন, আমার বাবা, কোনো সাহায্য তো দূরের কথা, একটু সিম্প্যাথি পর্যন্ত দেখালেন না। সব শুনেটুনে

বললেন, সুধাময়কে চেনো? বললাম, কোন সুধাময়? গাঁজার ব্যবসা? বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, ফক্কুরি শিখেছো খুব। তার গাঁজাই দেখলে, সুন্দরী সুশীলা একটি মেয়ে আছে তাকে তো দেখলেনা। বললাম, আপনি তো দেখেছেন বাবা।— নিশ্চয়ই দেখেছি। দরকার বলেই দেখেছি।—দরকার? কার? বাবা প্রায় তেড়ে এলেন। তোমার স্টুপিড, তোমার। আমার ইচ্ছে সুধাময়ের মেয়েকে তুমি বিয়ে করো। বললাম, আমারো তাই ইচ্ছে বাবা।

[একটু দম নিয়ে]

অবশেষে মাথা পেতে নিলাম গাঁজার মেয়ে! কি ঝাঁজ মশায়। দম আটকে মরি! সেই গাঁজার মেয়েই এখন আমার ঘরে—ফ্যান্সি! উচ্চতা চার ফুট আট ইঞ্চি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অর্থাৎ কালো। য়্যাম্বি ব্যবহার করে। দোহারা গড়ন। একপিঠ কোঁকড়ানো চুল। ঝোলা-ঝোলা গয়না জবরজং পোষাক পছন্দ করে। দুবার কম্পার্টমেন্টালে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ। পার্ট ওয়ানে হিস্ট্রিতে ব্যাক পেয়ে আর এগোয়নি। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। সেলাই এমব্রয়ডারির কাজ জানে। 'ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি', 'পতি পরম গুরু'—এ রকম অনেক সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এসেছে। আধুনিক গান শেখে। একটা গানের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সব রকম সিনেমার কাগজের নিয়মিত পাঠিকা। এখন তার একমাত্র ইচ্ছে, ওর মেয়ে ড্যান্সিকে গোড়া থেকে একটা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াবে। বিয়ের বছর ঘুরতে না-ঘুরতে আমাদের একটি মেয়ে হলো। ওই ড্যান্সি। ওর মা ফ্যান্সিই নাম রেখেছে। মিলিয়ে। ফ্যান্সি এখন স্ত্রী-স্বাধীনতা এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব ভাবে। আমি একদিন বলেছিলাম, এখন একটা ছেলে হলে সবদিক থেকে

ভালো হতো। শোনার পরের দিনই ফ্যালি টিউব্যাকটোমি করিয়ে নিয়েছে। আমাদের মেয়ে বড়ো হচ্ছে। চোখের সামনে বাপ-মায়ের সম্ভবং স্বাধীনতা অ্যাডজাস্টমেন্টের নমুনা দেখে বেটি এমন তৈরি হয়েছে যা আর কহতব্য নয়। ভালোয় ভালোয় একটা বোর্ডিং-এ পাচার করে দিয়ে আমরাও বাঁচি, ও-ও বাঁচে। এইবার ফাঁকা বাড়িতে শুরু হলো আমাদের স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম! ওফ্, সে এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়! গোড়ার দিকে, মানে বিয়ের কিছুদিন বাদে হতো কবির লড়াই। তারপর গরম লড়াই। এখন চলে ঠাণ্ডা লড়াই। এখন আমরা অনায়াসে মিথ্যে কথা বলি। বিয়ের আগে কে কি করেছি তা নিয়ে খোঁটা দিই। বিয়ের পরেও কে কি করছি তা-ই নিয়ে নোংরামি করি। আবার আলোয় বেরিয়ে আসি। ও ওর কপালের কালশিটে দাগ দেখিয়ে বন্ধুকে বলে, আলমারির কোণে হঠাৎ ঠোকা লেগেছে। আমি আমার গালের খিমচির দাগ দেখিয়ে বলি, ঘুমের মধ্যে হয়তো পেত্নীতে আঁচড়ে দিয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা সভ্য হয়েছি। কতো ত্যাগ স্বীকার করে তবে না আধুনিক হয়েছি। এখন আর কোনো অশান্তি নেই। এক রকম মানিয়ে নিয়েছি। তবে আমাদের গল্পের নটে গাছটা দিনে দিনে কি রকম নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, এই যা দুঃখ। এ-গাছটা যেদিন একদম মরে যাবে সেদিন আমরা আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার গোল্ডেন্ জুবিলি উৎসব ঘটা করে পালন করবো। তবে সেটা যতদিনে না একদম মরে যাচ্ছে তা তো আর সম্ভব হচ্ছেনা। সম্ভব হতো যদি আমরাও ওই পুলিনদের মতো হতে পারতুম। পুলিন লরি চালায়। থাকে বস্তিতে—আমাদের বাড়ির পেছনেই। ওদের দেখি, ওরা কিছু লুকোয় না। আমাদের লুকোতে হয়। অবশ্য লুকোতে পারাই তো

সভ্যতা! যে যতো স্বভাবকে লুকোতে পারে সে ততো সভ্য—একথা কে না জানে। সেদিক থেকে শালা পুলিন যারপরনেই অসভ্য। কি রকম জানেন? রাত্রে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ্যাটাক্ কাউন্টার-এ্যাটাকের পর আমি অনেক সময় আমাদের পেছনের ঝুল-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। পুলিন তখন হয়তো জলপথে বাড়ি ফিরছে। আমাদের বারান্দা থেকে ওদের ঘরের ভেতর অবধি সব দেখা যায়। দেখি, পুলিনের বউ এসে দরজা খুলে দিলো। বাইরে থেকে তার রাগ-টাগ কিছু বোঝা যায়না তবে রোজ রোজ কাঁচা ঘুম উঠতে হয়, এক-আধদিন মেজাজ ঠিক থাকেনা। সেদিনও মুখে কিছু বলেনি, দরজা খুলে দিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছিলো। বাস, পুলিনের স্পিরিট-মেশানো রক্তে এক ফুলকি আগুন। চেঁচিয়ে উঠলো, সিনেমায় গিছিলি বুঝি? ঢং শিখে এয়েচিস, না? দরজা খুলে দিলি. সোয়ামীর হাতখানা ধরতে কি নাগর বারণ করে দিয়েচে র্যা? এরপর মার। বউটা কাঁদে। চলে যাবে বলে ভয় দেখায়। পুলিন বলে, হ্যাঁরে, গেলেই ছেড়ে দিলাম আর কি! ও বলে, তবে রোজ রোজ মারবে কেন? পুলিন গর্জন করে ওঠে, বেশ করবো, মারবো। সোয়ামীর ডিউটি করেচি মেরেচি। বউটাও কম যায়না। সমানে মুখে মুখে জবাব, আহাহাহা, আর আদর করাটা বুঝি সোয়ামীর ডিউটি না?' পুলিন বলে, হাঁ, সেটা নাইট ডিউটি! তারপর কি বলবো, সেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই নাইট ডিউটি শুরু করে দিলো। সে কি নৃশংস আদর!

[হতাশ স্বরে]

ওদের বাড়ির দাওয়ার পাশে একটা লাউলতা এমন তকতক করে বেড়ে উঠেছে, দেখে আমার হিংসে হয়। পুলিনের বউ তার মার-

খাওয়া ভাঙা আঙুল নিয়ে রোজ সেই লতাটার গোড়ায় জল দেয়, ছাই দেয়। একদিন শুনলাম, বউটা কোথায় চলে গেছে, পাড়ার এক জোয়ানের সঙ্গে। অমন যে পুলিন তাকে আমি কাঁদতে দেখেছি। তারপর দু-একমাস বাদে সে-ও আবার কাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে। ওরা কতো সহজে পারে। আমরা পারিনা। এ রকম স্ট্রেট্‌কাট্‌ ব্যাপার সমাজের উঁচুতলায়ও খুব দেখা যায়। কেবল আমাদের তলাটাই স্যাঁতসেঁতে! আলো-আঁধারি! মিথ্যে আর ছলনার গুমোট! ভয়ানক আনহেল্‌দি! আমাদের গল্পের নটেগাছটা তাই শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ে তবু মরেনা। যাকগে, এখন আমার জীবনে একটি মাত্র ভাবনা, কিছু গুছিয়ে নিতে না পারলে আর সময় পাবো না। তবে ওই গুছিয়ে-নেওয়া মানে এস্‌ট্যাব্‌লিশ্‌মেন্টের কথায় আসবার আগে আমার বাবাদের পয়েন্টটা একটু ক্লিয়ার করে নিতে চাই। ভারচুয়্যালি বাবা আমার তিনজন। মেকলে বাবা! লৌকিক বাবা আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অলৌকিক বাবা! মেকলে বাবা আমার জীবনের চীফ্‌ ডিজাইনার এ্যাণ্ড্‌ প্ল্যানার! লৌকিক বাবা দিয়েছেন পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করার সুযোগ আর প্রতিষ্ঠা। আর অলৌকিক বাবার দয়ায় পেয়েছি জীবনের সৌরভ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যশ! আমার দু বাবা আজ আর মরধামে নেই—মেকলে বাবা আর লৌকিক বাবা। আর অলৌকিক বাবা আছেন বিদেশে। সেখানে মঠ-মন্দির স্থাপন করে আছেন। দেশে বড়ো একটা আসেন না। কাজেই তাঁকেও নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়। তাই আজকের এই মহতী জনসভায় আমি একটি শোক-প্রস্তাব পাঠ করবো এবং বাবাদের আত্মার শান্তি কামনা করে দু'মিনিট নীরবতা পালন করবো।

[পকেট থেকে শোকপ্রস্তাব বের করে
পাঠ :]

আজিকার এই সভা অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিন মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে ও অবর্তমানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। মহাপুরুষগণের বিদেহী ও বিদেশী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

[যথারীতি নীরবতা পালন]

এবার সর্বজনপ্রিয় গোপালের বাবা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে আমরা তাঁর সুযোগ্য সন্তান গোপালচন্দ্রকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[বক্তার ভঙ্গিতে গোপাল এগিয়ে গেল]

মাননীয় সভাপতি গোপাল এবং সমবেত ভদ্র গোপালগণ, গোপালের লৌকিক বাবা আজ আর নেই কিন্তু গোপালের জন্যে তিনি যা করে গেছেন তা সর্বকালের সর্বদেশের বাবাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলতে গেলে গোপালের হাত ধরে এক-এক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে তাকে ওপরে—আরো ওপরে উঠতে সাহায্য করে গেছেন। কি কর্মময় পুরুষ! তিনি আমাকে বলতেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না, তুমি শুধু আমাকে অনুসরণ করো। সেই জ্ঞানবৃদ্ধ গোপাল শেষ জীবনে আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন এক অমূল্য উপহার—একটি অসাধারণ গবেষণার কাজ।

[খানিকটা উত্তেজিতভাবে]

নিন্দুকরা অবশ্য বলে, তিনি নাকি ছাত্রের থিসিস্ চুরি করে এ-কাজ করেছিলেন। মিথ্যে কথা। তিনি অবশ্য সারাজীবন নিজে বই লিখেছেন খান দুয়েক কিন্তু সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁর গুডউইল ব্যবহার করতে দিয়েছেন কমপক্ষে দশ-দশটা পার্টিকে। সমবেত সুধী গোপালবৃন্দ, আপনাদের কাছে বলতে বাধা নেই, শুধু ছাত্রদের

মুখ চেয়ে আর শিক্ষা বিস্তারের কথা ভেবে তিনি একটি ফ্যাক্টরি খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন—নোট মেকিং এ্যাণ্ড্ এগ্‌জামিনেশন্ প্রসেসিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। সেখানে নোট, মেড-ইজি, সিওর সাক্‌সেস্, ডাইজেস্ট্—হরেক রকম মাল তৈরি হতো। এ সবের পেছনে লক্ষ্য ছিলো তাঁর একটাই, শিক্ষার পথ অবারিত করা। ব্যক্তিগত জীবনেও সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, প্রেমময় স্বামী, কর্তব্যপরায়ণ পিতা। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন আর জামাই কটি যা হয়েছে, আমি বলতে পারি, দে আর্ স্পেশালি মেড্ টু বি দ্য সন্‌স্-ইন্-ল অফ্ ছাট্ ম্যান্। যেমন ফরসা, তেমনি টাক! অসাধারণ ভালো রোজগার, অচিন্তনীয় ব্লাট! সে আর তিনি কি করবেন বলুন। তাঁর শেষ জীবনে আর একটা কাজই বাকি ছিল, আমাকে কোথাও ফিট করে দিয়ে লৌকিক বন্ধন ত্যাগ করে সরে দাঁড়ানো।

[শোকে অভিভূত]

আমি আর বলতে পারছি না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। হায়! আমি তাঁর অধম সন্তান আজ এডুকেশন লাইন ছেড়ে ভুষির ব্যবসা করি।

[কেঁদে ফেলে। চোখ মোছে।]

আমি জানিনা, এখন আমার এ ভুষি-কলুষিত জীবনে কি করে যশ-প্রতিষ্ঠার সৌরভ দেখা দেবে। আজ কে আমাকে আশা দেবে, কে ভরসা দেবে, কে শোনাবে জাগরণের অভয়বাণী!

[অদৃশ্য কোনো স্থান থেকে কে গোপালের নাম ধরে ডাকল। গোপাল বিমূঢ়।]

কে? কে শোনালো জাগরণের অভয়বাণী!

[হঠাৎ যেন সামনে গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে।]

কে? কারে হেরি সম্মুখে আমার? গুরুদেব, আপনি! কোন্ ঐশী শক্তিবলে আপনি জানতে পারলেন, ভক্তের আকুল হৃদয় এখন—এই মুহূর্তে ঠিক আপনার চরণকমলই স্মরণ করছিলো?

[কাল্পনিক গুরুদেবের পায়ে পড়ে কেঁদে ফেলে।]

এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সংসার-বৈতরণী মাঝে আমি এক আনাড়ি মাঝি, গুরুদেব। আমার হাল ভেঙে গেছে, পাল ছিঁড়ে গেছে।...আপনি আসন গ্রহণ করুন গুরুদেব।...বসবেন না? আচ্ছা আপনি কি আমার ডাক শুনেই সুদূর বিদেশ থেকে ছুটে এলেন, গুরুদেব?...আপনি আসেন নি? তাহলে সেই বিদেশেই আছেন অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি? ওহ! হাউ মিরাকিউলাস্! তাহলে নিশ্চয়ই

[দর্শকদের দেখিয়ে]

এই পাঁচটা পাবলিক আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না?...আমি ছাড়া আপনার কথা কেউ শুনতেও পাবেন না? ওহ! হাউ রিডিকিউলাস্! ...হ্যাঁ, বলছি, কেন আপনাকে স্মরণ করেছি বলছি। কি হয়েছে জানেন গুরুদেব, আমি এক গ্যাঁড়াকলে পড়েছি।...আজ্ঞে?

[হঠাৎ লজ্জা পেয়ে]

হ্যাঁ, ঠিকই। কথাটা একটু ভাল্‌গার হয়ে গেছে। মানে আপনাকে হঠাৎ অসময়ে পেয়ে এমন ইমোশন্যাল্ হয়ে গেছি, ভাষার সংযম-টংযম আর থাকছে না। গুরু-চণ্ডালী হয়ে যাচ্ছে! আমি বলতে চাই, মানে আমার খুব বিপদ!...জানিনা। কেন তা জানিনা। আপনার আশীর্বাদে অভাব তো কিছু নেই। তবু যে কেন, কি নেই

বলে ভেতরে এই নিদারুণ হাহাকার আমি জানিনা। আপনি বলে দিন গুরুদেব।...যশ! শুধু যশ নেই বলে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে? আর ইউ সিওর?

[হঠাৎ কান মলে নাকে খৎ দিয়ে]

এক্স্‌কিউজ্‌ মি, গুরুদেব, আপনি কি আর সিওর না হয়ে কিছু বলেন। তাহলে নেকস্‌ট্‌ পয়েন্ট, সে অমূল্য বস্তু আমি কি করে পাবো?... আজ্ঞে? পলিটিক্স! মানে রাজনীতিতে নামতে হবে? আপনি বলছেন পলিটিক্স ছাড়া রাতারাতি বিখ্যাত হবার আর কোন চান্স নেই? বাই জোভ্‌! গুরু— !

[হঠাৎ গুরুদেবকে আর দেখতে না পেয়ে একদম ভেঙ্গে পড়ে]

একি! আপনি কোথায় গেলেন!

[আর্তস্বরে]

গুরুদেব, দেখা দিন। আমি যে শেষবারের মতো আপনাকে প্রনামটাও করতে পারলাম না।

[কাঁদে। কিছুক্ষণ বাদে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ও চিৎকার করতে থাকে]

মার দিয়া কেল্লা! দৈব আদেশ! আমার জয়ের আকাশে অচঞ্চল ধ্রুবতারা—পলিটিক্স। আজ থেকে আমি নামী। দেয়ালে দেয়ালে আমার নাম! বিরোধীদলের খিস্তি-কন্টকিত আমার নাম!

[উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে বাড়ির ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ায়]

ক্যান্সি।

[হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে]

ক্যালি? ক্যালিকে কোথায় পাবো? হঠাৎ ওর কথাই বা মনে পড়লো কেন? এক দিনের জন্যেও আমাদের দাম্পত্য জীবন তো সুখের ছিলো না। শালা কার যে কি রোগ বোঝাই দায়!

[ম্লান হেসে]

আসলে ওর স্যুইসাইডের ব্যাপারটা এতো নিখুঁতভাবে চেপে দেওয়া হয়েছে যে আমি নিজেও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে পারি না, ও নেই। আজ আছে নীলিমা। আমার সৌভাগ্যের আকাশে নীলিমা। নীলি, আমার দ্বিতীয় পক্ষ। সে আবার ভয়ানক ডেলিকেট। রিজার্ভড। উচ্ছ্বাস হৈ-চৈ একদম বরদাস্ত করতে পারে না। কি যে ও চায় আমিও জানিনা। তাই একটু দূরে দূরেই থাকি। এখন আর ওদিকে নয়। তার চেয়ে নিরাপদ দোতলার এই নিরালা বারান্দা। বসে একটা সিগারেট খাওয়া যাক।

[ইজিচেয়ারে বসল। সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নীচে রাস্তার যান-বাহন চলাচল দেখতে থাকে।]

আমার চোখের সামনে কল্লোলিনী কলকাতা! কলকাতা কবে তিলোত্তমা হবে কে জানে!

[হঠাৎ রাস্তায় কাউকে দেখতে পেয়ে]

আরে হরিপদবাবু যে, বাজারে চললেন? রিটায়ার করার পরও মুক্তি নেই? ছেলেগুলো করে কি, বুড়ো বাপকে বাজারে পাঠায়?··· তাইতো। জেনারেশনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো। দিনরাত আজেবাজে ধান্দা আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।···বৌদি ভালো আছেন?···আচ্ছা আচ্ছা, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

[রাস্তা দিয়ে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ-ভ্যান চলে গেল। আবার কাকে দেখতে পেয়ে]

বিপ্লব যে, কি ব্যাপার? সেই ফিল্মস্টার-নাইট কাল না কি? মাই গড্!

[হেসে নিজেকে দেখিয়ে]

আমি প্রধান-অতিথিই ভুলে বসে আছি।...ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছো? কে বলে?...বাবারা! ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা তো ভাবে, বাজার-করা আর রেশন-তোলাই সংসারের একমাত্র কাজ! সেই যে রবিঠাকুরের কবিতায় আছে না, 'চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা', ওরা হলো তা-ই।...ডেফিসিট? কৈ, আমাকে তো কেউ বলেনি? কতো?

[হাত নেড়ে অভয় দিয়ে]

হবে, ওর জন্যে আটকাবে না। সন্ধেবেলা আসবে?—নিশ্চয়ই আসবে। তোমাদের জন্যে আমার দরজা সব সময়ই খোলা ভাই।... আচ্ছা।

[হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে গ্লাসে মদ ঢেলে নিল। রাস্তায় মিছিলের স্লোগান। আবার কাকে দেখতে পেয়ে]

কি মিসেস্ মুখার্জী, আপিস? আপনার ডিপার্টমেন্টে খুব হাঙ্গামা চলছিলো শুনেছিলাম? মিটে গেছে?...নিশ্চয়ই, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে বৈকি। দেখুন, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, জোর করে কেড়ে নিতে হয়।... হাঁ, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে।... আচ্ছা। দাদাকে বলবেন, একদিন যাবো আপনাদের বাড়িতে।

[কারখানার ভোঁ বাজল। গ্লাসের মদ
খেয়ে নিয়ে আবার খানিকটা ঢেলে নিল]

বিনোদ কি ডিউটিতে যাচ্ছো ?···মালিক বলেছে কারখানা বন্ধ করে দেবে ? কেন ?···ও শালারাই তো দেশের এক নম্বর শত্রু। কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে আর লেবারকে দুটো পয়সা দিতে বুক ফেটে যায়। তবে জমানা এায়সাই নেহি রহেগা বিনোদ। কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ে যাও। জয় তোমাদের হবেই।

[রাস্তার গাড়ি ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ার
শব্দ। গ্লাসে অনেকটা মদ ঢেলে নিল।]

রাম রাম জী, রাম রাম ! কারখানা আপনার লক-আউট ? কেন ? এইতো সেদিন দাবী-দাওয়া মেনে নিলেন ? আবার কি হলো ?··· ছি ছি, এই করে কি আর প্রোডাক্‌শন্‌ চলে ! ইকনমির বারোটা বাজিয়ে দিলে শালারা।···যা বলেছেন। কেন করবে, ব্যবসা বাণিজ্যের তো এই হাল। এদেশে টাকা ইনভেস্ট্‌ করবে মরতে ? ···নিশ্চয়ই, শুনে খুব খারাপ লাগছে।···আসবেন বৈকি। সে তো আমার সৌভাগ্য !···রাম রাম !

[হাত তুলে নমস্কার করে। দূরে কোথাও
ট্রেন চলে গেল হুইসিল দিয়ে। আচ্ছন্নের
মতো রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।
আবার কাউকে দেখতে পেয়ে]

এই ইয়াসিন, কোথায় চললে ?···দেশে ? বজবজ লাইনে ?···তা তোমাদের ওদিকে এবার ধানটান কেমন হলো ?···· চাষবাস ছেড়ে দেবে ? সে কি গো ? ..শেষে শহরে এসে চাকরির দুর্বুদ্ধি হলো তোমার ? তোমরাই তো ভাই জাতির মেরুদণ্ড।

[হেসে]

না আমি গ্রামে যাইনি কখনো। তোমার ছেলেমেয়ে কটি ?...আচ্ছা। ...তোমার মেয়ের বিয়ে ? বয়স কতো ?...দশ-এগারো ? বাহ্। ভাবতেও মজা লাগে। আগে তো আমাদের দেশে গৌরীদান প্রথা চালু ছিলো, জানো তো ?...ছেলের পড়া ছাড়িয়ে দিয়েছো ? বাহ্! বেশ করেছো! তোমাকে সাহায্য করছে ? বাহ্! এই তো চাই!

[হাত মুঠো করে ওপরে তুলে শ্লোগানের ভঙ্গিতে]

জয় জওয়ান! জয় কিষান!...মেয়ে-জামাইকে নিয়ে একদিন এসো, আমি দেখবো।

[হাত নেড়ে]

আচ্ছা ভাই।

[দর্শকদের লক্ষ্য করে]

এরি নাম পাবলিক রিলেশন্‌স্। জনসংযোগ ছাড়া কি জননেতা হওয়া যায়। আজ আমি সার্থক। হাজার রকম সোস্যাল কাজ! সভাপতি, প্রধান-অতিথি, পেট্রন—একেবারে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাচ্ছি। যুবকদের আমি গুরু—গোপালদা। গ্রামে না গেলেও শুনেছি, কৃষকদের মধ্যেও আমি ভয়ানক পপুলার। মজুরদের চোখে তো দেবতা। মিড্‌ল্‌ক্লাস মহলে আমার প্রভাব তো এক কথায় অভাবনীয়। তাদের সব রকম ন্যায্য দাবী-দাওয়া—যেমন কাজের চাপ কমাবার দাবী, লেটে-যাবার সুবিধে-সুযোগ—সব ব্যাপারে সামনে আছি আমি। এ বলে চাকরি দাও, ও বলে লোন দাও, সে বলে ফ্ল্যাট দাও, পারমিট দাও—সে কী কাণ্ড! অথচ বিশ্বাস করুন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শী আমার কাছে যে যা চেয়েছে

আমি কিন্তু কাউকেই কিছু দিইনি, শুধু কথা দিয়েছি। বলেছি, হবে, সব হবে, একটু সময় দাও। তাতেই সবাই খুসি। সত্যি, বড়ো সরল এ-দেশের মানুষগুলো। কিছু চায় না, খালি আশ্বাস চায়। আর যাদের আমি আমার সব দিয়েছি, আমার নীলিমা, আমাদের সুজাতা-শঙ্খ, তারা এখন আমার এই প্রাসাদের মতো বাড়ির এ-ঘরে ও-ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

[আলো কমে আসে। ঘুমের গভীরতা দ্যোতক কোনো মিষ্টি যন্ত্রসংগীত]

নীলিমা খুব ঘুমকাতুরে! যখন ঘুমোয় এতো মায়া হয় আমার! সুজাতাও ঘুমুচ্ছে। ওর ফুলের মতো নিষ্পাপ মুখের ওপর চুল উড়ে পড়েছে হয়তো। ঘরময় রজনীগন্ধার গন্ধ! শঙ্খও তাই। হয়তো বাবু মোজা খুলতেও ভুলে গেছে। বই পড়তে পড়তে—বাস ঘুম! ওদের তো কোন ভাবনা নেই। ওরা তো জানে, ওদের আমি আছি। আমিও ওদের শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ধন্য! তবে মিথ্যে বলবো না, শঙ্খ, আমার ছেলে, আমার কাছে একটা প্রশ্ন। গোপালের ছেলেতো গোপালই হয়, ও শঙ্খ হলো কি করে? কে জানে! নামটা ওর নিজেরই নির্বাচন।

[হাই তুলে আরামের শব্দ করে]

আহ! আমারো ঘুম পাচ্ছে। কী শান্ত স্নিগ্ধ রাত! ছুটো কাজ এখনো বাকি। ডায়েরি লেখা আর নীলিমা বিকেলে বেরবার সময় চাকরের হাত দিয়ে যে চিরকুটটা পাঠিয়ে দিয়েছিলো সেটা পড়ে দেখা।

[উঠে দাঁড়িয়ে]

রাত কত হলো কে জানে।

[একটা পেঁচার ডাক]

দেখি রেডিও-য় কি প্রোগ্রাম!

[রেডিও খুলে দিল। কীর্তন হচ্ছে—মাথুর পালা। গোপাল ডায়েরি নিয়ে বসে খসখস করে খানিকটা লিখল। তারপর ডায়েরি বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রেখে নীলিমার চিরকুটটা খুলল। পড়ল। উদাস চোখে চেয়ে রইল। সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। উঠে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল। তারপর মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।]

নীলিমার সেই চিরকুটটা! একটা ব্যাপার হয়েছে, অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। এ রকম ঘটনা মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও বেরোয়। এতে লেখা আছে, নীলি—

[হঠাৎ থেমে গিয়ে]

না আমি বরং তাঁর পুরো নামটাই বলি, নীলিমা। নীলিমা উপস্থিত আমার এ-বাড়ির কোথাও নেই এবং এ-বাড়িতে সে আর নাকি কোনোদিন ফিরবেও না। সে আর একজনের সঙ্গে চলে গেছে। আমার চেয়েও ঢের বিখ্যাত লোক! নীলিমা তার নিজের বলতে যা ছিলো সবই নিয়ে গেছে শুধু বিয়েতে আমি তাকে যে মুক্তোর আংটিটা দিয়েছিলাম, সেটা রেখে গেছে।

[খানিক বাদে ভোঁতা গলায়]

অর্জুন সিং, মাইজির ঘরের দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দে।

[হঠাৎ তীব্র শব্দে ফোন বেজে ওঠে। রিসিভার তুলে]

হ্যালো, কে?...সুজাতা!...এতো রাত্রে তুমি কোত্থেকে কথা বলছো? ...সুবল মানে? সেই যে কবিতা লেখে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক

ছোকরা? তার আবার বাড়ি কোথায়? সে তো বোধহয় বস্তি-টস্তিতে থাকে।...তুমি—তাকে—আজ—বিয়ে করেছো? সুবলকে? ও! সুখী হও, আর কি বলবো।

[হঠাৎ ব্যস্তভাবে]

হ্যালো সুজা, আমি একটু আগে স্বপ্ন দেখছিলাম—হাঁ, স্বপ্নই বোধহয়, তুমি তোমার ঘরে ঘুমচ্ছো, তানপুরা খোলা, গীতবিতান পাশে—হ্যালো, হ্যালো সু—।

[ফোন কেটে গেছে। অদ্ভুত অস্বাভাবিক গলায়]

গর্জন সিং, দিদিমনির ঘরের দরজাতেও একটা বড়ো তালা লাগিয়ে দে।

[নীচে একটা ভারী মোটরগাড়ি এসে থামল। হেডলাইটের আলো বারান্দার ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। গোপাল এগিয়ে গিয়ে নীচে তাকিয়ে]

কে? কার গাড়ি?...থানা থেকে? কেন?...শঙ্খ খুন।...কি বললেন, আমার ছেলে এক্স্ট্রিমিস্ট্। শুনুন, ওকে আপনারা চেনেন না। ও সব আজেবাজে ব্যাপারে ও কোনো দিনই ছিলো না। থাকবেও না। হি ইজ্ এ ব্রিলিয়ান্ট্ বয়! এই তো কিছুদিন আগে একটা কম্পিটিটিভ্ এগ্জামিনেশনে বসেছিলো এবং আমি জানি, ও তাতে স্ট্যাণ্ড্ করবে। ওর টেস্ট্ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই আপনাদের। ও ছেলে করবে রাজনীতি! বাইরে বেরিয়ে বড়ো জোর দু একটা বিদিশি ফিল্ম-টিল্ম দেখে। বাড়ি থাকলে হয় বই পড়ে, তা নাহলে গীটার বাজায়। একটি মেয়েকেও ভালোবাসে। মেয়েটি আজ বিকেলেও এসেছিলো। বোধহয় একসঙ্গে কোথাও বেরবার কথা

ছিলো। দাঁড়ান না, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হোক, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি আপনাদের সামনে।···কি বললেন?

[গলা কাঁপছে]

তার লাশ আপনাদের ভ্যানে? ঠিক বলছেন? না, তাহলে আমি আর নীচে নামতে চাইনা।···শুনুন, পারলে সেই মেয়েটিকে, যার শঙ্খের বউ হবার কথা ছিলো, ওর ডেডবডিটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। ছেলেমানুষ তো, আমার কথা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

[শ্লথ হাত শূন্যে তুলে]

আচ্ছা, গুডনাইট!

[গাড়ি চলে গেল। গোপাল বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে]

গর্জন সিং, দাদাবাবুর ঘরে সবচেয়ে বড়ো তালাটা লাগিয়ে দে!

[হঠাৎ গোপাল জন্তুর মতো এক বোবা কান্নায় গুমরে ওঠে]

নাউ, 'আই অ্যাম দ্য মনার্ক্ অফ্ অল্ আই সার্ভে।' এই নির্জন অন্ধকার দ্বীপে আমি একচ্ছত্র সম্রাট! আমাকে ঘিরে সুখ-দুঃখে সমুত্তাল সংসার-সমুদ্র!

[সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে-পড়ার শব্দ। প্রায় অন্ধকার মঞ্চের মাঝখানে তখন গোপাল একা। আস্তে আস্তে চারদিকের পরিবেশে সে যেন ভয় পাচ্ছে। হঠাৎ চমকে ওঠে]

কে? এই বিনোদ, কি হচ্ছে? আধ্লা ইটটা মেরোনা! লেগে

যাবে। এই ইয়াসিন, তোমার হাতে ওটা কি? ছোরা! কেন? বিপ্লব, হাতে পাইপগান কেন? শোনো, আমার কথা শোনো তোমরা। হরিপদবাবু, ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

[ক্রমাগত আঘাতে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে]

আহ্, ইয়াসিন, তোর পায়ে পড়ি। মিসেস মুখার্জী, ওদের বারণ করুন। মেরোনা, আমি মরে যাবো। ওহ্, আমাকে বলতে দাও। শোনো, আমার কথা শোনো। ওহ্, মেকলে, তোমার মানসপুত্র মিউজিয়ামে চললো! বাবা, তুমি কোথায়? গুরুদেব, একটা মিরাকেল্ ঘটান। এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিন। লাখ টাকায় মন্দির করে দেবো, গুরুদেব। মেরোনা। শোনো। আমি কন্‌ফেস্ করছি, হাঁ, আমি মিথ্যে কথা বলি, কথা দিয়ে কথা রাখি না, ঘুষ খাই, চুরি করি। হাঁ, সব ঠিক। আমি অবিচার করেছি তোমাদের ওপর। কিন্তু কেন করেছি। শোনো, আমি সুবিধেবাদী, স্বার্থপর, কেরিয়ারিস্ট্। বাট্ আই অ্যাম্ অল্‌সো দ্য প্রোডাক্ট্ অফ্ দিস্ সোসাইটি। চিফ্ ডিজাইনার্ এ্যাণ্ড্ প্ল্যানার্ লর্ড মেকলে! একটা হিউম্যানিটারিয়ান্ পয়েন্ট, কেন করেছি আমি। করেছিলাম, নীলিমা, সুজাতা আর শঙ্খের জন্য। আর তারা কি করলো! কোথাও একটা জায়গা তো আমায় দেবে। তাহলে নীলিমারা অন্তত ফিরে আসুক, ওদের মাঝখানে আমার লাশটা ফেলে দাও। ওরা কাঁদুক, আমি অন্তত গতানুগতিক সুখে মরে বাঁচি। আমি হয়তো ভুল করেছি, অন্যায় করেছি কিন্তু আমি তো তোমদেরই ভাই, বন্ধু, সন্তান। আমাকে অন্তত একটা সুযোগ তোমরা দাও।

[স্বাভাবিক গলায়]

দিস্ উড্ বি দ্য স্ট্যাডেন্ট্ কনক্লুশন্ অফ্ দ্য স্টোরি অফ্ গোপালচন্দ্র !

[গলা তুলে]

প্যাক্ আপ্ প্লিজ্।

[আবার দর্শকদের দিকে চেয়ে যখন কথা শুরু করে তখন মঞ্চ আলোয় আলোময়]

আমি তো শুরুতেই আপনাদের বলেছিলাম যে, আমি আপনাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত কিন্তু মাঝে মাঝে কেউ কেউ এমন ভাব করেন যেন কস্মিনকালেও আমাকে কোথাও দেখেন নি। কি, দেখেন নি ? আয়নায় ?

[সকলকে নমস্কার করে গোপাল ভেতরে চলে যায়।]

যবনিকা

ক্ষুচিকের লড়াই

পূর্ণাঙ্গ নাটক

পাত্রপাত্রী

জুলিয়াস্ ফুচিক [ক]	:	চেক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক
জোসেফ্ পেসেক্	:	একটি চেক স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক
কারেক্ মালেৎস	:	প্যানক্র্যাট্‌স্ জেলে তরুণ কয়েদী
জোসেফ্ জেলিনেক	:	চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় বিপ্লবী দলের বয়স্ক সদস্য
বার্টন [ঘ]	:	কাংকারের পার্টি-সেলের সদস্য
মিরেক [ঙ]	:	জুলিয়াস ফুচিকের সহকারী
এ্যাড্‌লফ্ কোলিনস্কি [গ]	:	প্যানক্র্যাট্‌স্ জেলখানার চেক রক্ষী
সপ্‌পা	:	প্যানক্র্যাট্‌স্ জেলখানার কর্তা
জোসেফ্ বম্	:	জার্মান কমিশার
ওয়েস্নার	:	প্যানক্র্যাট্‌স্ জেলখানার ডাক্তার
ফ্রিড্‌রিখ্ [চ]	:	কমিউনিস্টবিরোধী তদন্ত অফিসের কর্তা
স্মোত্তানস্কি [খ]	:	প্যানক্র্যাট্‌স্ জেলখানার জার্মান রক্ষী
স্মার্টি	:	ঐ
স্কোরেপা	:	ঐ
ডোরাক্	:	জার্মান গোয়েন্দা
মিসেস্ জেলিনেক	:	মি. জেলিনেকের স্ত্রী
অগাস্তিনা ফুচিক্	:	জুলিয়াস ফুচিকের স্ত্রী

এস্. এস্. সৈন্যরা ● চেক্ বন্দীরা

[ক], [খ] ইত্যাদি অভিনেতা বিশেষের
ব্যক্তিগত নাম নির্দেশ করেছে।

[মঞ্চের এক পাশে একটা মাইক্রোফোন। এ ছাড়া এ-নাটকে আলাদা আলাদাভাবে যে-সব দৃশ্যাংশ অভিনীত হবে তারজন্য দরকারী যাবতীয় সেট ও সরঞ্জাম মঞ্চের একদম পেছন দিকে মজুত করা থাকবে।

মাইক্রোফোনের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই জুলিয়াস ফুচিকের চরিত্রে অভিনয় করবেন। পোষাক পরে মেক্-আপ নিয়ে তিনি সেইভাবেই প্রস্তুত। এ ছাড়া তিনি ভাষ্যকারও বটে। যখন ভাষ্যকার তখন তাঁকে তাঁর নিজের নামেও ডাকা যেতে পারে। অন্যান্য

অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। অভিনয়াংশ ছাড়া সকলেই পরস্পরকে দরকার মতো আসল নামে সম্বোধন করে কথাবার্তা বলতে পারেন।

মাইকের সামনে ভদ্রলোককে খুব উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে। তিনি কিছু বলবেন কিন্তু যেন মনঃসংযোগ করতে পারছেন না। মঞ্চের ভেতর দিকে একটু-আধটু গোলমালও হচ্ছে। সেদিকে তাকাচ্ছেন আবার দর্শকরা যে সামনে বসে আছেন সে বিষয়েও সচেতন। এই ভাবে পনের-কুড়ি সেকেণ্ড কেটে গেল। তারপর কতকটা আশ্বস্তভাবে দর্শকদের দিকে চেয়ে সমীহভরে হেসে নমস্কার করলেন।]

স্ফুটিক। নমস্কার। ক্ষমা করবেন, আমি কিছুক্ষণ ঠিক মনোযোগ দিতে পারছিলুম না, দেওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না বলাই ভালো। আসলে আমাদের মতো যারা থিয়েটার করেন বা বলা যায়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান, তাদের এতো রকম ঝঞ্ঝাট, মানে শুদ্ধ ভাষায় গুছিয়ে বললে বলতে হয়, 'প্রতিকূল পরিবেশে যেন অস্তিত্বের সংগ্রাম।' তা নাহলে কার্টেন উঠে যাবার পরও—কি হবে, শেষ অবধি ঠিকঠাক উৎরে যাবে তো—এসব ভাবতে হবে কেন?

[নিজের পোষাকের দিকে চেয়ে সহজভাবে হেসে]

আমি অবশ্য মেক-আপ নিয়ে পোষাক পরে একরকম রেডি।

তা ওরা বললো, আপনি যান না, গিয়ে শুরু করে দিন। গোড়াতে তো দুএক কথা বলবেন বলছিলেন। আমরা যাচ্ছি। হচ্ছিলো আমাদের এই গ্রুপ থিয়েটারের দুরবস্থার কথা। আমরা মরে যাচ্ছি। মরছি, অতীতে যা করেছি হয়তো এখন তার ফলভোগ করছি। আবার এ-ও হতে পারে যে, আমাদের তো কেউ পৃষ্ঠপোষক নেই, মানে থিয়েটারের মধ্য দিয়ে আমরা যা বলি, দেখাই তাতে তথাকথিত পৃষ্ঠপোষকদের পোষকতা পাবার কোনো কথাই ওঠে না। কাজেই হয় মরো, না হয় লড়ো। লড়ে বাঁচো। মনে করলেই হয়, এটা গ্রুপ থিয়েটারের অজ্ঞাতবাসের সময়। ভবিষ্যতে যদি আবার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে থাকে, দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করো। শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই লড়বার জন্যে রসদ জোগাড় করে রাখো। মোটকথা, সময়টাকে 'নতুন করে আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতিপর্ব' বলে মেনে নাও। এ ছাড়া আর কি বলবো? কাঁদুনি গেয়ে তো লাভ নেই? ধরুন, যাত্রা। শান্তিগোপাল মশায়ের টাইম থেকে এমন মোড়ই মারলো, আর সব আউট। সে যাকে বলে মাইকেলের ভাষায় 'রিপুদলবলে দলিয়া সমরে' রণক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। তারপর ধরুন, পাব্লিক ষ্টেজ। সে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পঞ্চানন ঘোষাল অবধি ইজারা নিয়ে বসে আছে। এরা হল নাট্য-ব্যবসায়ে জেনারেল সাপ্লায়ার্স। বাজারের ডিম্যাণ্ড এই, টেণ্ডার কল্ করো, ম্যানুফ্যাক্চার করো, টাইমলি মালটা ডেলিভারি দিয়ে দাও। একে ব্যবসায়ী তায় মাথামোটা ইণ্ডিয়ান ব্যবসায়ী। এদের ধারণা, যে কোনো পণ্যদ্রব্যের

ওপর সুন্দরপনা মেয়েছেলের ছবি থাকলে মালটা কাটে ভালো। এ ছাড়াও ধরুন হাফ্‌গেরস্ত গ্রুপ থিয়েটার বলে বাংলাবাজারে একটি দ্রব্য আছে। সে যে কি জিনিস! এরা গোড়াতে শুরু করে গ্রুপ থিয়েটারের স্লোগান দিয়ে তারপর পয়সার সোয়াদ পেলে, না ঘাট্‌কা, না ঘরকা। তখনও হাবভাবে গ্রুপ থিয়েটার, ভেতরে ভেতরে আঠারো আনা কমার্শিয়াল। আসলে মিড্‌ল ক্লাস তো, কেরিয়ার য়্যাচিভ্‌মেন্টের লাইন যেমনি পেয়ে যায় তখন 'স্ত্রীপুত্র পরিবার তুমি কার, কে তোমার'—ভাবখানা এমনি। এরা চান্স পেলে ফিল্ম করে, পক্ষকালব্যাপী জাতীয় নাট্যোৎসবে কোঁচার ফুল বাগিয়ে মুরারিও করে, ছোটো ছোটো দলের ছেলে-ছোকরা-দের ওপর মোড়লি করে। ওদের একেবারে নিশ্চিত ধারণা, ওদের অতি সূক্ষ্ম এক্‌স্পেরিমেন্ট্‌-টেন্ট্‌ দেশের লোকজন কিছুই বোঝেনা। নাটকের গাইড লাইনও ওরাই দেবে। মানে টপ্‌ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। তারপর আমরা। 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা—।' আমরা [হাত জোড় করে] অতি অভাজন গ্রুপ থিয়েটার। আমরা তলানি! লেবু আনতে আমাদের পান্তা ফুরোয়। আমরা এই নাট্যজগতের শ্রমদাস। আমাদের অভাবও কোনোদিন ঘোচে না, নামযশও ভাদ্দরবউর মতো পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আমরা তাই এখন আক্ষরিক অর্থে অস্তিত্বের লড়াই লড়ছি। আর লড়াইটা যেহেতু অস্তিত্বের তাই এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। আমাদের ঘর-বার একাকার হয়ে গেছে। এই রকম একটা অবস্থার চাপে সবাই এক জোট হয়ে বললো, ঠিক হ্যায়, লড়তে যদি হয়ই একই

সঙ্গে দু ফ্রন্টে লড়বো। একদিকে বাস্তব জীবন আর একদিকে শিল্পের বাস্তবতা। সমস্যা হলো, এ রকম নাটকীয় ব্যাপার পাবো কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পছন্দ মতন একটা বিষয় পেয়ে গেলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার লড়াই।

[এমন সময় অসম্পূর্ণ মেক্-আপ নিয়ে যিনি মঞ্চে ঢুকলেন তিনি নাটকে স্মোতোন্‌স্কি বলে একটা চরিত্রে অভিনয় করবেন। কিন্তু এখন ফুচিক ও স্মোতোন্‌স্কি নিজেদের সত্যিকারের নাম ধরে কথা-বার্তা বলবেন। ধরা যাক, ফুচিকের নাম ক, স্মোতোন্‌স্কির খ, এবং এইভাবে আর কেউ থাকলে তাদেরও যথাক্রমে গ, ঘ বলে উল্লেখ করা হবে।]

স্মোতোন্‌স্কি। ক-দা।

ফুচিক। বলো।

স্মোতোন্‌স্কি। গ জিজ্ঞেস করছিলো, ও কি হিটলারের মেক্-আপ নেবে? আর তো সময় নেই।

ফুচিক। [হেসে] কাণ্ড দেখেছেন, গ্রেট্ ডিক্‌টেটর্ হিটলার, গোঁফ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছে, গোঁফ সাঁটবে, না সাঁটবে না? বেচারা! আসলে আমিই বলেছিলাম যে, দাঁড়াও বাবা, হিটলার-টিটলার থাকবে কিনা একটু ভেবে দেখতে হবে। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, আমিও সমানে বকে যাচ্ছি, ও-ও মেক্-আপ নিতে পারছে না। কি অবস্থা! [স্মোতোন্‌স্কিকে]

শোনো খ, তুমি আজকের মতো ওকে বারণ করো।

স্মোক্তোনৃঝ। ও আজ নামছে না ?

ফুচিক॥ না।

স্মোক্তোনৃঝ। আচ্ছা। [চলে যাচ্ছিল]

ফুচিক। এই খ।

স্মোক্তোনৃঝ। [দাঁড়াল] বলুন।

ফুচিক। গ-কে বলো যে, আমরা তো পুরো সেকেণ্ড ওয়ার্লড্ ওয়ার্ বা জার্মানীর কাছে পরাজিত চেকোশ্লোভাকিয়া—এ রকম করে সব ব্যাপারটা দেখাতে পারবো না। আমরা যেটুকু না হলে নয়, মানে ফুচিকদের লড়াইকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে সব মানুষেরই লড়াই বলে মনে করি তাহলে তার আউট লাইনটা মাত্র দেবো। এই একটু আগে এদেরও তাই বলছিলাম যে, এটা হল আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। [হঠাৎ স্মোক্তোন্ঝকে] কার বলো তো ?

স্মোক্তোনৃঝ। [অপ্রস্তুত] আজ্ঞে ?

ফুচিক। [হাসতে হাসতে] দুয়েরই—দুয়েরই। গ্রুপ থিয়েটারেরও, চেকোশ্লোভাকিয়ারও। কাজেই বেশি ফেনিয়ে কি হবে। আমরা গোপন আন্দোলনের আইন-কানুন, তার মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে আসে, ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের নমুনা, বন্দীদের সংঘবদ্ধ জীবন, শত্রু শিবিরেও মিত্র, মানুষের বাঁচার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা—এইভাবে পয়েন্টগুলো টাচ্ করে যাবো! আমাদের লড়াইয়ে হিটলার-টিটলার খুব ভাইট্যাল্ ফ্যাক্টর না।

স্মোভোন্‌স্ক। আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি।

ফুচিক। আর হিটলার হিম্‌সেল্‌ফ একটি জাস্তব ব্যাপার। ব্যাটা এতো লাফ-ঝাঁপ মারতে চাইবে যে এ গরীব থিয়েটারের ভাড়া-করা স্টেজের বারোটা বেজে যাবে। ওকে বলে দাও, গোঁফ যেন না সাঁটে।

স্মোভোন্‌স্ক। ঠিক আছে।

ফুচিক। হোক না, হতে দাও না, সরকার যদি জাতীয় মঞ্চ-টঞ্চ করে দেন তখন দেখা যাবে কে কতো লাফাতে পারে। [হাসে]

স্মোভোন্‌স্ক। [হেসে] আচ্ছা।

ফুচিক। আর তোমরা এবার চলে এসো, শুরু করতে হবে।

স্মোভোন্‌স্ক। হ্যাঁ আসছি, আমাদের হয়ে গেছে।

[তাড়াতাড়ি চলে গেল]

ফুচিক। আমরা এমনিতেও হিটলারকে আর নাই দিতে চাই না। আটতিরিশ সাল থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ক্রমাগত নাই দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছিলো। তার শরীরে তখন আর্যরক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিলো। জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার খোয়াব দেখে দেখে তার আহার-নিদ্রা চুকে গেছে। কে কোথায় জার্মানদের ওপর অত্যাচার করেছে, এই ধুয়ো তুলে বলে বসলো, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড তার চাই। হিটলার চাইছে, দিয়ে দাও। প্রথম বলি, অস্ট্রিয়া। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতান জেলার জার্মান সংখ্যালঘুরাও দেখলো, এতো ভারি রঙ্গ। তারাও পরিত্রাহি চেঁচাতে শুরু করলো, চেক গভর্মেন্ট তাদের মেরে ফেলছে।

তারাও খাস জার্মানীর সঙ্গে মিলিত হতে চায়। বিষয়টা জরুরি, ভেবে দেখতে হয়। মাথাব্যথা সবচেয়ে বেশি ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের। উনত্রিশে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. নেভিল চেম্বারলেন, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মি. দালাদিয়ের, ইটালীর মুসোলিনী আর জার্মানীর হিটলার স্বয়ং মিউনিকে এক টেবিলে মুখোমুখি বসল। কেন? চেকোশ্লো-ভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ হবে। না, চেকোশ্লোভাকিয়ার কেউ সেখানে ছিলেন না। এমন আশ্চর্য ঐতিহাসিক সম্মেলনের কথা কেউ কখনো শুনেছে? সেদিন রাত দুটোয় চার মূর্তি মিউনিক চুক্তিতে সই করবে বলে যখন কলম হাতে নিল তখন দেখা গেল বিরাট দোয়াতদানিতে এক ফোঁটা কালি নেই।

[হঠাৎ মঞ্চের আলোও সব নিভে গেল।
অন্ধকারে ফুচিকের গলা শোনা যাচ্ছে।]

কি হলো ভাই লাইটম্যান? মিউনিকের দোয়াতদানির কালি কি এই হলের মধ্যে ঢেলে দিলেন নাকি?

[আবার আলো জ্বলে উঠল]

আপনি কি অন্ধকার করে দিয়ে সিম্বলিক্ এফেক্ট্ আনতে চাইছিলেন নাকি? আশ্চর্য! ঠিক করে কাজ করুন। নাটক হলে দেখবেন এরপর থেকে পৃথিবীর ইতিহাস আগাগোড়াই মসীলিপ্ত। তা বলে থিয়েটার তো অন্ধকারে করা যাবে না। [প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে] হাঁ, যা বলছিলাম, আটত্রিশ সালের পয়লা অক্টোবরের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার এক তৃতীয়াংশ চলে গেল হিটলারের মুঠোয়। চেক প্রেসিডেন্ট এমিল হাচা প্রতিবাদ করেছিলেন। হিটলার তাকে বার্লিনে ডেকে নিয়ে

গিয়ে নাৎসী কায়দায় এক চুক্তিপত্রে জোর করে স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। আর উনচল্লিশ সালের পনেরই মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়া সেই চুক্তি বলে জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হলো আর জার্মান সৈন্য চেক রাজধানী প্রাগে ঢুকে পড়লো।

[এই সময় এক কোলিন্‌স্কি ছাড়া আর সবাই একে একে মঞ্চে ঢুকে পড়লেন। সকলেই যে যার পোষাক মেক্‌-আপ নিয়ে কমবেশি ব্যস্ত।]

আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনারা এমন ভাবে ঢুকে পড়লেন যেন জার্মান সৈন্য চেক রাজধানী প্রাগে সত্যি সত্যি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তো সবাই জার্মান নন, চেক লোকজনও তো আছেন।

পেস্‌ক। সে-ভাবে দেখলে জার্মানও নেই, চেকও নেই।

ফুচিক। সেকি ?

মারিয়া। রঙ্গ যা কিছু তা তো বহিরঙ্গে।

সপ্‌পা। পোষাকে আর মেক্‌-আপে।

ডোরাক। ভেতরে ভেতরে ও-ও যা, আমিও তা।

স্মার্টি। কলকাতা আর মফঃস্বলের কিছু নাট্যকর্মী।

অগাস্তিনা। বা নাট্যজগতের শ্রমদাস।

[সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।]

ফুচিক। বেশ চোখা চোখা কথা বলছেন তো !

বম্‌। এবং কি রকম শ্রেণীসচেতন দেখেছেন ?

ফুচিক। তাই নাকি ?

পেসেক। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করে দেখুন।

ওয়েসনার। হাঁ, কোনো আপত্তি নেই।

ফুচিক। সর্বনাশ। এ আমি কোথায় আছি প্রভু?

মিরেক। কলকাতাতেই আছেন।

[সবাই হাসলেন।]

ফুচিক। আচ্ছা আপনাদের যদি বলি, নিজের নিজের পরিচয় দিয়ে যে যার শ্রেণী ঠিক করে নিন, পারবেন?

ফ্রিড্‌রিখ। আলবৎ।

ফুচিক। বেশ। আমি তো জুলিয়াস ফুচিক, আমাকে একটা দল ধরে এর পক্ষে আর বিপক্ষে—এই ভাবে দাঁড়ান তো?

জোসেফ। শুরু করি?

ফুচিক। করুন। [হঠাৎ বাধা দিয়ে] দাঁড়ান তো। [অভিনেতাদের সারিটা ভালো করে দেখে নিয়ে] কোলিনস্কি কোথায়? থ? থ-কে দেখতে পাচ্ছিনা?

ম্যাটি। ও এখনো আসেনি।

ফুচিক। [বিস্ময় ও রাগ] আসেনি মানে? এটা কি ইয়ার্কি মারার জায়গা? আর কখন আসবে? ও [বার্টনকে], তুমি রেডি থাকবে তো, ডুপ্লিকেট, কোলিনস্কির।

বার্টন। যদি এরমধ্যে এসে পড়ে?

ফুচিক। এসে পড়লেই হলো যখন খুসি? ঠিক আছে আসুক, দেখা যাবে। [জেলিনেককে] নিন, আপনি শুরু করুন।

জেলিনেক। [একপাশে সরে গিয়ে] আমি জোসেফ জেলিনেক, বাস কণ্ডাক্‌টর।

[মি. জেলিনেকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল
তার স্ত্রী মারিয়া জেলিনেক।]

মারিয়া। আমি ওঁর স্ত্রী মারি জেলিনেক, এক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করি।

জেলিনেক। আমরা একটি চেক পরিবারের সাধারণ মানুষ।

মারিয়া। তবে অনেক দিন থেকেই আমরা দুজনে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করছি।

জেলিনেক। জার্মান অধিকারের পরও টানা তিন বছর অন্তরালে থেকে আমরা পার্টির কাজ করে গেছি।

মারিয়া। ভাবতে লজ্জা করে, অবশেষে একদিন আমাদেরই বাড়িতে কমরেড জুলিয়াস ফুচিক ধরা পড়লেন জার্মান গোয়েন্দা ও পুলিশের হাতে।

জেলিনেক। কিন্তু আমরা ফুচিককে ভালোবাসতুম, ওঁর আদর্শে বিশ্বাস করতুম তাই আমরা ওঁরই দলে।

[দুজনে ফুচিকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।]

বম্। আমি কমিশার জোসেফ বম্, গেস্টাপো বিভাগের পুরণো লোক। [কাঁধের ফিতে দেখিয়ে] কালো-সাদা-লাল ফিতে দেখছেন ? এটা পেয়েছি আমি আমার সাহসের জন্যে। কমিউনিস্ট-নিধন আমার পবিত্র কাজ। তবে মিথ্যে বলবো না, হিটলারের ন্যাশনাল্ সোস্যালিজম্, ও আমি কিছুই বুঝতাম না। মোটকথা, যুদ্ধে নেমেছি নিজের স্বার্থে। আমার কি রকম জানেন, বন্দীদের খুব একটা মারধর বা জেরা-ফেরা করা ও আমার কোনো দিনই ভালো লাগতো না। তবে বাজপাখির মত হঠাৎ ধাঁ করে দু-দশটা শিকারকে গ্রেপ্তার

করে ঘায়েল করে ফেলা, বেশ লাগতো। ওই তো ফুচিক। বলুন না, গ্রেপ্তারের সেই প্রথম রাত ছাড়া আমি আপনাকে আর কখনো মারধর করেছি ? বরং ওকে নিয়ে ব্রোনিকে যেতাম, বারে বসে গল্পগুজব করতাম।

ফুচিক। সেটা নিশ্চয়ই আমাকে খুসি করার জন্যে নয়, প্রলুব্ধ করতেন যাতে গোপন খবর বের করা যায়।

[বম্ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল]

আমি চুপচাপ বসে থাকতুম। আপনি বকে যেতেন, জানি তুমি তোমার প্রাহাকে ভালোবাসো। কী সুন্দর প্রাহা! তুমি চলে গেলেও তো সে এমনি সুন্দর থাকবে। তবে কেন চলে যাবে ?

বম্। [তেমনি হাসতে হাসতে] আর আপনি বলতেন, তোমরা চলে গেলে প্রাহা আরো সুন্দর হয়ে উঠবে।

[এই সময় যে কোলিনস্কি করবে, সে একেবারে মেক্-আপ নিয়ে খুব সংকোচের সঙ্গে ঢুকল।]

কোলিন্স্কি। আসবো ?

ফুচিক। [বিরক্তভাবে তার দিকে চেয়ে] এসো। [কোলিন্স্কি ভীড়ের মধ্যে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। ফুচিক একবার তার রিস্টওয়াচে সময় দেখে নিলেন। কিছু সময় সকলেই নিশ্চুপ। তারপর বম্‌কে বললেন] বলুন।

বম্। আর কি বলবো। আমি এক জার্মান কমিশার। আপনার পক্ষে আর দাঁড়াবো কোন আক্কেলে। [জোসেফ বম্ আলাদা

লাইন করে গিয়ে দাঁড়াল।] স্মেতোন্‌ঝ. স্মাটি, স্কোরেপা আর যারা এস. এস. সৈন্য তারা তো বাবা আমার পাশে এসে দাঁড়ালেই ল্যাটা চুকে যায়।

ফুচিক। আপনি কিছু ডিক্‌টেট্‌ করবেন না।

বম্‌। না, এতো সহজ কথা। ওরা যদি ভুলেও আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, থিয়েটার টিয়েটার ভুলে পাবলিকই প্যাঁদাতে শুরু করবে।

[স্মেতোন্‌ঝ আর সব সৈন্যদের ইঙ্গিত করতে তারা বমের লাইনে গিয়েই দাঁড়াল।]

বার্টন। আমি বার্টন। জাংকারের পার্টি-সেলের সদস্য। আমার পার্টি মনে করে, জুলিয়াস ফুচিকের গ্রেপ্তারের পরোক্ষ কারণ আমিই। গোপন আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমার সেল আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছিলো। আমার বন্ধু মি. জেলিনেক যোগাযোগ করিয়ে দিতেও রাজী হলেন। কিন্তু আমার অসাবধানতায় গেস্টাপো গোয়েন্দা ডোরাক এসব জানতে পেরেছিলো। ফলে জুলিয়াস ফুচিক সেদিন ধরা পড়লেন। আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতক তো নই।

[বার্টন ফুচিকের লাইনে দাঁড়াল। কোলিনস্কি তখন মিরেকের কানে কানে কি সব বলছিল। ফুচিক তা লক্ষ্য করলেন।]

ডোরাক। আমিই ডোরাক। সেদিন ঐ বার্টনের কাছ থেকে খবর

পেয়ে আমাদের হ্যাকশনে আমরা একেবারে অভাবিত সাফল্য লাভ করেছিলাম। আমি যা করি, অকপটে স্বীকার করি এবং নিজের জায়গা বুঝে দাঁড়াতেও পারি।

[এই সময় কোলিনৃস্কি আবার মিরেকের সঙ্গে কথা বলল।]

ফুচিক। [রেগে গিয়ে কোলিনস্কিকে] তুমি তখন থেকে কথা বলছো কেন? দেরি করে আসবে, লাইনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, ব্যাপার কি?

[কোলিনৃস্কি চুপ করে যায়। এবার এগিয়ে এল সপ্‌পা।]

সপ্‌পা। আমার নাম সপ্‌পা। খাঁটি জার্মান। পোল্যাণ্ড থেকে এসেছি। আগে কামারশালে গরম লোহা পেটাতুম, এখন বন্দীশালে গরম গরম মানুষ পেটাই। আমি প্যানক্রাট্স জেলখানার কর্তা। অনেক ছলচাতুরী তোষামোদ করে চাকরিটি পেয়েছি। আমার কাছে এইটে বজায় রাখাই হলো প্রধান কাজ। ও শালা চেক্ বন্দীই বলো আর জেলখানার কর্মচারীই বলো, আমার কাছে সব সমান। আমি বুঝি হিটলারের পতন মানেই আমারো পতন। সোজা বুঝি, সোজা পথে চলি।

[সপ্‌পা সোজা ফুচিকের বিরুদ্ধ দলের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। এগিয়ে এলেন জোসেফ পেসেক।]

পেসেক। যেদিন টের পেলাম আমার মতো ষাট বছরের বুড়ো স্কুল মাস্টারকেও ওরা ভয় পায় সেদিন বুঝলাম ওদের হিটলারের হম্বিতম্বি কতো ফাঁকা! আমি জোসেফ্ পেসেকও নাকি

ওদের জার্মান রাইখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। প্রমাণ কি? চেকোস্লোভাকিয়া স্বাধীন হলে চেক স্কুলগুলো কেমন হবে আমি তার একটা খসড়া করেছিলাম। বাস্, ঢুকিয়ে দিলে জেলখানায়। ঐ ফুচিকের পঁচাশি দিন আগে থেকেই সেই নরকযন্ত্রনা আমি ভোগ করেছি। বয়সে সবার চেয়ে বড়ো তো, ফুচিক, কারেক আমাকে তাই বাবা বলে ডাকতো। আমি বড়ো জোর ওদের দুঃখ-দুর্দশায় একটু সান্ত্বনা দিতুম, প্রেরণা দিতুম। তাতেও ওই ফ্রিড্‌রিখ একদিন চেঁচিয়ে বললো, তুমি শালা সবচেয়ে দাগী মাল। তা ওদের চোখে যে দাগী সে আর ওদের দলে গিয়ে দাঁড়াবে কি করে।

[পেসেক ফুচিকের পাশে চলে গেলেন। এগিয়ে এল ফ্রিড্‌রিখ।]

ফ্রিড্‌রিখ। আমি চেকোস্লাভাকিয়ার প্রাহার পেট্‌চেক্ বিল্ডিং-এ আমাদের কমিউনিস্টবিরোধী যে তদন্ত অফিস রয়েছে তার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ফ্রিড্‌রিখ্।

[ফ্রিড্‌রিখ্ ফুচিকের বিরুদ্ধ দলের দিকে পা বাড়াল]

ফুচিক। আপনার আর কিছু বলার নেই?

ফ্রিড্‌রিখ। আমি মনে করি, পৃথিবীর পয়লা নম্বরের শত্রু কমিউনিস্টরা। শালাদের মেরে—

[ফ্রিডরিখ কথা শেষ করতে পারল না। অসুস্থ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ফুচিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। আর সকলে ভীড় করে এগিয়ে এল।]

ফুচিক। কি হলো চ?

[ফ্রিড্‌রিখ কতকটা সামলে নেবার পর]

কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?

ফ্রিড্‌রিখ। হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেলো।

ফুচিক। আজ তুমি আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছি, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তোমাকে।

ফ্রিড্‌রিখ। আপিস থেকে সোজা আসছি তো।

ফুচিক। কিছু খাও-দাও নি?

ফ্রিড্‌রিখ। সময় পাইনি।

ফুচিক। আমাদের টিফিন দেওয়া হয়েছে তো?

মারিয়া। খায়নি। আমি দেখলাম, সাইডব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো।

ফুচিক। খেয়ে নিতে পারলে না?

ফ্রিড্‌রিখ। রোজই বাড়ি গিয়ে ছোটো ছেলেটাকে বলি, বাবাই, আজ আমাদের থিয়েটারে সন্দেশ দিয়েছিলো, কেক দিয়েছিলো। শুনে অনেক দিনই বলেছে, তুমি সব একা একাই রাক্ষসের মত খেয়ে আসো। আমার আর মায়ের জন্যে একদিন নিয়ে আসতে পারো না। আজ তাই ভেবেছিলাম—

ফুচিক। তোমার ছেলের জন্যে মাধবকে বলে একটা আলাদা প্যাকেট আজ নিতে পারতে, রোজই তো দু একটা বেশি থাকে। যাও, ভেতরে গিয়ে আগে খেয়ে এসো।

ফ্রিড্‌রিখ। কাজটা হয়ে যাক না।

ফুচিক। চ, আমরা যা-ই করি, সুস্থভাবে বেঁচে-থাকার জন্যেই করি, তাই না?

ফ্রিড্রিখ। যাচ্ছি।

ফুচিক। ও [মিরেক], ওকে ভেতরে দিয়ে এসো তো।

[মিরেক ফ্রিড্রিখকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। এবার আলোয় এসে দাঁড়াল ওয়েস্‌নার।]

ওয়েস্‌নার। আমি প্যান্‌ক্রাট্‌স জেলখানার ডাক্তার ওয়েস্‌নার। তবে জেনে রাখুন, যার শিকার আগলে আমি সারাক্ষণ বসে থাকি তার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আমি এ রাষ্ট্রের নীতিতে বিশ্বাসী নই, স্থায়িত্বেও বিশ্বাসী নই। আমি আমার পরিবার ব্রেস্‌লাউ থেকে প্রাগায় আনিনি অথচ রাইখের এমন অফিসার নেই বললেই চলে যারা অধিকৃত দেশে চেপে বসে বিলাসিতার এমন সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছে। অবশ্য এ থেকে যদি কেউ ভেবে থাকেন যে যারা আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গোপনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমার সুগভীর প্রেম তাহলে মারাত্মক ভুল করবেন। আমি, বলা যায়, কোনো দলেই ভিড়িনি।

[ওয়েসনার ফুচিকের বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়াল। ফুচিক তার অবস্থা দেখে আর সবার দিকে তাকাতেই সবাই একসঙ্গে হেসে ফেলল।]

হাসলেন যে ?

ফুচিক। বলা আর যায় কি করে ?

ওয়েস্‌নার। কেন ?

ফুচিক। সবাই তো দেখতে পাচ্ছে, কোন দলে গিয়ে ভিড়লেন।

মুখে আনা সম্ভব না। বললো, তোমার মা কিছু ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঘর করে না। ও সব মেয়েমানুষের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া যে প্রোডাক্‌শনে ওরা সবচেয়ে বেশি পয়সা পিটেছে, লোকটা নাকি বলেছে, তাতেই তার বাজারে ধারদেনা হয়ে গেছে। শোধ করতে হচ্ছে।

কোলিন্‌স্কি। আমাকে বললো, যখন তখন টাকার জন্যে ছিঁচিরিপনা করতে বারণ করে দেবে তোমার মাকে।

ফুচিক। তারপর?

কোলিন্‌স্কি। মা থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে।

ফুচিক। এসব তো আমি কিছুই জানতুম না। আমাকে বলতে পারতে। আমাদের আর কিছু না থাক, পরস্পরের জন্যে বিবেচনা সহানুভূতিটুকু আছে। আজকে অন্তত তোমার রোলটা অনায়াসে অন্য কেউ করে দিতে পারতো।

কোলিন্‌স্কি। ঠিক আছে, আমিই করছি।

ফুচিক। করো।

কোলিন্‌স্কি। আমি এ্যাড্‌লফ্‌ কোলিন্‌স্কি, জার্মান বন্দীশালার চেক রক্ষী। আমি শুধু চেয়েছিলাম, ওই বন্দীশালার অন্ধকারের কথা দুনিয়ার মানুষ জানুক। শিউরে উঠুক। অসহ্য বিবেক যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে বুঝুক, পৃথিবীর বুকে যখন এতো পাপ তখন জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। ফুচিক অন্ধকার সেল থেকে তাঁর স্বাধীনতার আলো-পিপাসু মনটাকে বাইরের জগতের দিকে মেলে ধরতে চাইতেন। আমি শুধু একটা জানালা খুলে

দিয়েছিলাম। শত্রুর উর্দি গায়ে এর চেয়ে বেশি আর কি-ই বা পারতুম। কিন্তু যা-ই করিনা কেন, মানুষের চোখে তো আমি নাৎসী দালাল।

[কোলিন্স্কি আস্তে আস্তে ফুচিকের বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন।]

মিরেক। আমি আমাদের চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় বিপ্লবী দলের পুরণো কর্মী, ফুচিকের সহকর্মী মিরেক। গ্রেপ্তারের পর ওদের অত্যাচারে আমি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগে ওরা অনেক খবর আমার কাছ থেকে বের করে নিয়েছিলো। কিন্তু আমার ধারণা, কোনো মতেই একে বিশ্বাস-ঘাতকতা বলা যায় না। তবু ওরা আমাকে অন্যায়ভাবে পার্টি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমি যদি বিশ্বাসঘাতক হতাম, জার্মানরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতো না। তাই সমস্ত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও আমি জোর দিয়ে বলবো, জাতীয় বিপ্লবীদের আর সকলের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার আমারো আছে।

[ফুচিকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে এগিয়ে এল অগাস্তিনা ফুচিক।]

অগাস্তিনা। আমি জুলিয়াস ফুচিকের স্ত্রী অগাস্তিনা ফুচিক। আমার স্বামী গ্রেপ্তার হবার কয়েক দিন পর ওরা আমাকেও গ্রেপ্তার করেছিলো। বছরের পর বছর ধরে আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করেছি। সংগ্রামে দাঁড়িয়েছি পাশাপাশি। আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যে দেশকে ভালোবাসি তারই মাঝে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেরিয়েছি। কতো বিপদ,

কতো আনন্দের মুহূর্ত আমাদের জীবনে বার বার এসেছে, সে আমাদের গরীবের পরম ধন। [একটু থেমে] ১৯৪৩-এর ১৯শে মে ওরা আমাকে পোল্যাণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলো বেগার খাটতে।

[অগাস্তিনা ফুচিকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।]

ফুচিক। আপনাদের আত্মসমালোচনা চমকপ্রদ এবং আশাপ্রদ। তবে আমি দু একটি জায়গায় রদবদলের পক্ষপাতী। মিরেকের দাবী, তিনি জাতীয় বিপ্লবী দলের সারিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু পারেন কি? যাহোক, সত্য গোপন থাকে না। সে না হয় পরে দেখা যাবে। কিন্তু এ্যাডল্ফ কোলিনস্কি, আমার মনে হয়, আপনি নিঃসন্দেহে বিপ্লবীদলের প্রথম সারির সদস্য। [নিজের দল দেখিয়ে] আপনি অনায়াসে এদিকে চলে আসতে পারেন। [সকলের দিকে চেয়ে] আপনাদের এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হচ্ছে, জার্মান-অধিকার কায়েম হবার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ আপনা থেকেই দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। তাই না?

প্রায় সকলে। হাঁ।

ফুচিক। আসলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল আঘাত না এলে কে কোথায় দাঁড়াবো, কি ভূমিকা নেবো আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। ১৯৪২-এর জুনের মাঝামাঝি। জারি হলো সামরিক আইন। ফ্যাসিস্ট হিটলার চড়াও হল কমিউনিস্টদের ওপর। সংগঠনগুলো তছনছ হয়ে গেলো। হত্যা—লুণ্ঠন! দেশ

জুড়ে জঙ্গলের রাজত্ব। গোপন আন্দোলন ছাড়া বাঁচবার কোনো পথ নেই। কমিউনিস্টরা ধরা পড়ে প্রাণ দিচ্ছেন কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন না, কারণ তাঁরা জানতেন, ফ্যাসিবিরোধী ঘৃণার আগুন নিভে গেলে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম করা যায় না। তবু তার মধ্যেই দেখা দেয় ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা। গোপন আন্দোলনের কঠোর নীতি ভেঙে কাজ করলে তার পরিণাম— । [হঠাৎ অভিনেতাদের দিকে চেয়ে] শোনো, এখানে জুলিয়াস ফুচিক গ্রেপ্তার হলেন, এই দৃশ্যটি তুলে ধরতে চাই। সেট্‌টা সাজিয়ে দাও তো। কিন্তু ফ্রিড্‌রিখ আর কোলিন্‌স্কি, তোমরা দুজন আজকে এ কাজে হাত দিও না।

কোলিন্‌স্কি। আমি পারবো, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

ফুচিক। কিন্তু ফ্রিড্‌রিখ না। দুর্বল শরীর। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। দরকার নেই।

ফ্রিড্‌রিখ। ঠিক আছে।

[বিশেষভাবে ঐ দৃশ্যে যারা অভিনয় করবে তারা কাজে হাত দিল।]

ফুচিক। [অভিনেতাদের লক্ষ্য করে] সেট, জেলিনেকদের ড্রয়িংরুম। [দর্শকদের লক্ষ্য করে] ১৯৪২। ফুচিক তখন সাংবাদিক কবি। আর একদিকে চেক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য এবং পার্টির সেক্রেটারি। গোপন আন্দোলনের মুখপত্র 'রুদে প্রাভো'-র সম্পাদকও তখন তিনি। চব্বিশে মে সন্ধে দশটায় জেলিনেকদের বাড়িতে ফুচিকের যাবার কথা ছিলো। বাটন দেখা করতে আসবেন। ফুচিকের যাবার

ইচ্ছে ছিলো না। চারদিকে গোয়েন্দা গিজগিজ করছে। আবার না গেলে ওঁরাও ভয় পাবেন। দুবছর ধরে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী বড়ো বড়ো ব্যাপারে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছেন।

[বম্, ফ্রিড্‌রিখ এবং এস. এস. সৈন্যরা বাইরে চলে গেল।]

মিরেক। সেট রেডি।

ফুচিক। হাঁ, চলো। জোসেফ ও মারি জেলিনেক, বার্টন, ডোরাক আর মিরেক ?

মি. জেলিনেক। আমরা তো ভেতরে থাকবো। রেডি।

ফুচিক। কমিশার জোসেফ বম্, কমিউনিস্ট তদন্ত অফিসের কর্তা ফ্রিড্‌রিখ আর এস. এস. সৈন্যরা।

[বম্ উইং-এর পাশ থেকে মুখ বের করে।]

বম্। আমি আমার দলবল নিয়ে এখানে।

ফুচিক। আমি জুলিয়াস ফুচিক মি. জেলিনেকের বাড়ি দেখা করতে যাচ্ছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘড়িতে বাজবে সন্ধে দশটা। [গলা তুলে লাইটম্যানকে লক্ষ্য করে] লাইট। [সেটে আলো পড়ল] আমি সেই সুন্দর উষ্ণ বাসন্তী সন্ধ্যায় একটি বয়স্ক খোঁড়া লোকের ভান করে যতোদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হলাম মি. জেলিনেকের বাড়িতে।

[ফুচিক সেটে ঢুকতেই মি. জেলিনেক মারিয়া, মিরেক, বার্টন ও ডোরাক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন। তার আগে মিসেস জেলিনেক সবাইকে চা

দিচ্ছিলেন। মি. জেলিনেক চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বার্টন সামনে চা নিয়ে একটা বই পড়ছেন। আর একপাশে চা খেতে খেতে ডোরাক মিরেকের সঙ্গে গল্প করছে। ফুচিক ঢুকে লালসেলাম জানালেন। সকলে বসলেন। ফুচিক বসতে যাচ্ছেন, মিসেস জেলিনেক এক কাপ চা হাতে নিয়ে]

মারিয়া। আপনার চা।

ফুচিক। [চা নিয়ে] আপনার বাড়ির এক কাপ চা যেন এক পাত্র নৈতিক উৎসাহ! খেলেই শরীর মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই জন্যেই বোধহয় আমাদের কর্মীরা আপনাদের বাড়িটা এতো পছন্দ করে।

[মিসেস জেলিনেক তাঁর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন]

মিরেক। ইনিই [বার্টনকে দেখিয়ে] আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জাংকারের পার্টি সেলের কমরেড বার্টন।

[ফুচিক বার্টনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন।]

আর ইনি [ডোরাককে দেখিয়ে] মি. জেলিনেকের বিশেষ বন্ধু ডোরাক।

[ফুচিক কতকটা সন্দিগ্ধ চোখে ডোরাকের দিকে চেয়ে তার সঙ্গেও হ্যাণ্ডশেক করলেন।]

জেলিনেক। [ভোরাকের উপস্থিতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়ে] ভোরাক অনেকদিন থেকেই আমাদের পরিবারের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী। বিপদে-আপদে সব সময়ই পাশে আছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কয়েক বার প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। দুবছর ধরে যে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছি তা বোধহয় এর জন্যেই।

ফুচিক। আমরা তো এর আগে এঁকে আপনার এখানে কখনো দেখিনি?

জেলিনেক। আমরা কে কি ভাবে নেবো তাই সামনে আসতে চাইতেন না। তাছাড়া রাজনীতি ভালো বোঝেন না ঠিকই কিন্তু আমাদের কাজকর্মের ওপর অগাধ শ্রদ্ধা।

ফুচিক। হুঁ।

জেলিনেক। আপনি নিজেই আপনার কথা বলুন মি. বার্টন।

বার্টন। প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে আমাদের সেলের যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কিনা অনেকদিন ধরেই তা ভাবছিলাম।

ফুচিক। কেন?

বার্টন। চারদিকে যা অবস্থা, কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়তে চাইছে। এ অবস্থায় যদি দেখানো যায়, কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং নেতারাও আমাদের পেছনে আছেন তাহলে তা কতকটা কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

ফুচিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি অতো সোজা?

বার্টন। [বুঝতে না পেরে] আজ্ঞে?

ফুচিক। কেন্দ্রীয় সংগঠন বা নেতারা আপনাদের কর্মীদের পেছনে আছেন দেখতে গিয়ে সেই সংগঠন আর নেতাদের পেছনে আপনারাই যে হাজারটা বিশ্বাসঘাতক লাগিয়ে দেবেন না তার গ্যারান্টি আছে?

বার্টন। আমরা বিশ্বাসঘাতক লাগিয়ে দেবো?

ফুচিক। অসাবধানে?

বার্টন। তা অবশ্য হতে পারে?

ফুচিক। আপনারা অসাবধানে করে ফেলেছেন এই বিবেচনায় শত্রু কি আপনাদের ছেড়ে দেবে মি. বার্টন?

বার্টন। [মি. জেলিনেকের মুখের দিকে চেয়ে] আমি এভাবে অবশ্য ভেবে দেখিনি।

জেলিনেক। [বিমর্ষভাবে] আমিও না।

ফুচিক। আপনারা কষ্ট পাবেন এই ভেবে আমি যদি রূঢ় সত্য দেখিয়ে না দিতুম, আমি কি খুব ভালো করতুম?

বার্টন। না, নিশ্চয়ই নয়।

ফুচিক। আর মি. জেলিনেক, মনে রাখবেন, সৎ লোক ছাড়া কেউ বিপ্লবী হতে পারে না। যে নিজে অসৎ, সে দেশের মঙ্গলের কথা ভাবে—এর চেয়ে মিথ্যে কথা পৃথিবীতে আর নেই। আর দুনিয়ার সবাই যে আপনাদের মত সৎ নয়, এটুকু বোঝার মতো অসততা আপনার থাকা উচিত।

[কেউ কোনো কথা বলছেন না।]

মিরেক, শোনো। [মিরেককে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি কি বললেন, তারপর ফিরে এসে] হাঁ, শুনুন মি.

বার্টন, আপনাদের সবার সঙ্গেই আমরা দেখা করতে চাই, যোগাযোগ করতে চাই, কিন্তু এভাবে নয়।

ডোরাক। [একটু সংকোচের ভান করে] আচ্ছা আমি কি বাইরে অপেক্ষা করবো ?

ফুচিক। গোড়া থেকেই যখন আছেন তখন ঘরে থাকাও যা, বাইরে থাকাও তা। আসলে এক ঘরে এতো লোক জড়ো হবার মানে মৃত্যুর পথ সহজ করা। মি. জেলিনেককে আরো দু একটা কঠোর কথা বলবো। আপনি গোপন আন্দোলনের আইন-কানুন মেনে চলুন তা নাহলে আমাদের সঙ্গে কাজ করা ছেড়ে দিন। আপনারা নিজেদের বিপন্ন করছেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও।

বার্টন। তাহলে তাড়াতাড়ি কাজের কথাগুলো সেরে ফেলা যাক। আপনাদের রেড রাইট্স কাগজের পয়লা মে সংখ্যার জন্যে আমাদের এই লেখাটা—।

ফুচিক। বাস—বাস। দিয়ে দিন, পড়ে দেখবো। পয়লা মে পর্যন্ত যদি অবশ্য বাইরে থাকি আর বেঁচে থাকি। শুনুন মি. বার্টন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আপনার সেলের যোগাযোগ করিয়ে দেবার কথা আমার মনে রইলো। এ-ব্যাপারে এক্ষুণি আপনাকে কিছু বলবো না, পরে জানাবো।

বার্টন। আচ্ছা।

ফুচিক। জানেন, প্রাহার রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে মনে হচ্ছিলো, জীবনটা আকাশের মতো উদার অনাবিল, এখন মনে হচ্ছে, কতোগুলো ক্রিমিনালের নিষ্ঠুর হাত সব সময় তার কণ্ঠনালীর দিকে উদ্যত হয়ে আছে। চলি।

মারিয়া। এ বাড়ি থেকে আপনি তো কখনো এক কাপ চা খেয়ে চলে যান নি? [আর এক কাপ এগিয়ে দিলেন]

ফুচিক। না, আজকে আর আটকাবেন না।

জেলিনেক। এক কাপ চা খেতে আর কতোক্ষণ।

ফুচিক। [কাপ হাতে নিয়ে] হয়তো পুলিশ আসতে যতোক্ষণ।

জেলিনেক। আসলে মারি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসে।

ফুচিক। আমার তো ধারণা, আপনার মারি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন ওঁর নিজের ঘর সাজাতে। আর আমাদের কেন ভালোবাসে জানেন? উনি জানেন, সবার ঘর ঐশ্বর্যে ভালোবাসায় সাজাতে গেলে আমাদের আদর্শে বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

মারিয়া। আপনি এতো ভালো কথা বলেন।

ফুচিক। কাজ করিনা না কি?

[সকলে হেসে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় বেল বেজে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। যে যার অস্ত্রে হাত দিল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। বাইরে থেকে কমিসার জোসেফ বমের গলা শোনা গেল।]

বম্। [বাইরে থেকে] দরজা খোলো। পুলিশ।

মারিয়া। [ভয়ে ভেঙে পড়লেন] কমরেড!

জেলিনেক। আপনি জানালা টপকে পালাতে চেষ্টা করুন কমরেড।

ফুচিক। [প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন] পালাতে আর দিলেন কোথায়

কমরেড। [দৌড়ে জানালার কাছে যেতেই একটা গুলি ছুটে এল। ফুচিক মাথা নীচু করে মেঝেয় শুয়ে পড়েন] শুয়ে পড়ুন সবাই। জানালার নীচে দাঁড়িয়ে ঘর লক্ষ্য করে ওরা গুলি ছুঁড়ছে।

বার্টন। আমরা বাধা দেবো। লড়াই করে মরবো কমরেড।

ডোরাক। [বুকে হেঁটে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে] আমি একবার রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে দেখছি কমরেড।

ফুচিক। মিরেক, ওকে ফলো করো। আমার নিশ্চিত ধারণা শত্রু রান্নাঘর দিয়েই আসছে।

মিরেক। [রান্নাঘরের দিকে কিছুটা এগিয়েই ফিরে এল] ঠিকই বলেছো কমরেড, দরজা ভেঙে ওরা রান্নাঘরের ভেতর দিয়েই ছুটে আসছে।

বার্টন। আমরা তাহলে কি করবো?

ফুচিক। ধরা দিন। এতোগুলো প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না।

[দৌড়ে ঢুকল কমিশার জোসেফ বম্, তদন্ত বিভাগের কর্তা ফ্রিড্‌রিখ আর ডোরাক। সঙ্গে এস. এস. সৈন্যরা। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত অস্ত্র।]

বম্। [চিৎকার করে] ইউ চেক বাস্টার্ডস্, গেট আপ। অস্ত্র মাটিতে রেখে মাথার ওপর হাত তোল।

[বন্দীরা সকলেই তাই করলেন শুধু ফুচিক হাতে পিস্তল নিয়ে দরজার পাশে আত্মগোপন করলেন। একজন সৈন্য বন্দীদের অস্ত্রগুলো এক জায়গায় এনে জড়ো করল। সৈন্যরা বন্দীদের মুখো-

ঘুষি বন্দুক তুলে দাঁড়াল একদার সৈন্য।
আর কজন জানালা দিয়ে বাইরে তাক
করে দাঁড়াল। মি. জেলিনেক হঠাৎ বস্
আর ফ্রিড্‌রিখের মাঝখানে হাসিমুখে
ডোরাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
চিৎকার করে উঠলেন।]

জেলিনেক। মি. ডোরাক !

ডোরাক। [জেলিনেক-দম্পতির পাশে গিয়ে দাঁড়াল] মি. ডোরাক জেলিনেক পরিবারের দীর্ঘ দু বছরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। আমি মি. জান্দার।

জেলিনেক। বিশ্বাসঘাতক !

ডোরাক। তাই নাকি ? কি লজ্জার কথা ! [মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে হঠাৎ প্রচণ্ড ঘুষি মারতেই মি. জেলিনেক পড়ে গেলেন। মি. জেলিনেক ওঠার চেষ্টা করছেন। ডোরাক দু হাঁটুতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে।]

জেলিনেক। আপনারা কি মানুষ ! মানুষ নামে সবচেয়ে ঘৃণ্য জীব !

ডোরাক। তাই নাকি ? কি লজ্জার কথা। [লাথি মেরে জেলিনেককে ফেলে দিয়ে তাঁর হাতটা বুটের নীচে চেপে ধরে। মি. জেলিনেক যন্ত্রনায় ছটফট করছেন।]

মারিয়া। [দুহাতে মুখ ঢেকে] জোসেফ, দোহাই তুমি কথা বলো না।

[একটা সৈন্য মিরেকের পকেট সার্চ করে
বেশ কিছু কাগজপত্র পেল এবং এগিয়ে
গিয়ে ফ্রিড্‌রিখের হাতে দিল।]

ডোরাক। [হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে উঠল।] হুঁসিয়ার। পালের গোদাটা পালিয়েছে।

[জার্মান বাহিনীতে চঞ্চলতা। তৎপরতা।]

ফ্রিড্‌রিখ। কি করে পালাবে?

ডোরাক। ঘরের মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে। [মিরেককে দেখিয়ে] ওটা স্যাভাং।

বম্‌। ঘরো সার্চ করো।

[প্রায় সকলেই ঘরের ভেতরে বাইরে খুঁজে দেখতে থাকে।]

মারিয়া। [ফিস্‌ফিস করে] জো, এখন কি হবে?

জেলিনেক। আমরা এখন মরতে যাচ্ছি, মারি।

মারিয়া। [স্বামীর একটা হাত চেপে ধরে] জো।

সৈন্য। [মুহূর্তের মধ্যে মারিয়ার মুখে তার পিস্তল দিয়ে মেরে] প্রেমালাপ নিষিদ্ধ। করতে হয় তো আমার সঙ্গে ডার্লিং।

মারিয়া। [মুখের রক্ত মুছতে মুছতে অল্পবয়সী সৈন্যটার মুখের দিকে চেয়ে] যুদ্ধ কোথায় টেনে নামিয়েছে! এমন সুন্দর ছেলে অথচ এতো পশু।

[বম্‌ আর ফ্রিড্‌রিখ অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে মিরেক আর বার্টনের সামনে এসে দাঁড়াল। মিরেকের সামনে বম্‌ আর বার্টনের সামনে ফ্রিড্‌রিখ।]

বম্‌। সে কোথায়?

মিরেক। কে?

বম্‌। যে নেই।

মিরেক। জানি না।

[সঙ্গে সঙ্গে বমের ঘুষি খেয়ে মিরেক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।]

ফ্রিড্‌রিখ। তুই নিশ্চয়ই জানিস ?

বার্টন। না। [সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিড্‌রিখ ঘুষি মেরে বার্টনকে ফেলে দেয়।]

বম্‌। [মিরেককে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে] আমার যে মোট পাঁচজনের হিসেব চাই কমরেড।

মিরেক। শুনে নাও, স্পেনে লড়াই করেছি, ছ বছর ফ্রান্সের বন্দীশিবিরে কাটিয়ে এসেছি, অত্যাচারে মাথা নোয়াতে শিখিনি।

[বম্‌ ঘুষি মারতেই মিরেক আবার পড়ে গেল।]

ফ্রিড্‌রিখ। [বার্টনকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে] চারজন নিয়ে গেলে যে আমাদের চাকরি খতম হয়ে যাবে বাবা।

বার্টন। চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে সবাই ডোরাক নয়।

[ফ্রিড্‌রিখ ঘুষি মারতে বার্টন পড়ে গেল।]

বম্‌। [মিরেককে টেনে তুলতে তুলতে] কিন্তু আর একজন যে আমাদের চাই।

ফ্রিড্‌রিখ। [বার্টনকে টেনে তুলতে তুলতে] মোট পাঁচজন।

ফুচিক। [নীচু হয়ে মাটিতে নিজের হাতের পিস্তল ছুঁড়ে দিয়ে] এই যে আর একজন। [সামনে এগিয়ে এলেন।]

বম্‌। [সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে] হ্যালো কমরেড !

ফ্রিড্‌রিখ। লাল সেলাম।

[দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।]

বম্‌। [কাছে এগিয়ে গিয়ে] মাথার ওপর হাত তোলো।

[ফুচিক হাত তুললেন।]

বম্। আমার বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করো কমরেড [প্রচণ্ড ঘুষি মারল]

ফুচিক। [মাটিতে পড়ে গিয়ে] পাঁচজন তো পেয়ে গেছো, এবার নিয়ে চলো।

বম্। কি অপরিসীম আনুগত্য! এই না হলে বিপ্লব হয়! তা তুমি কে?

ফুচিক। অধ্যাপক হোরাক।

বম্। [ঘুষি মেরে] কে ঘুষি খেলো?

ফুচিক। অধ্যাপক হোরাক।

বম্। [আবার ঘুষি মেরে] এখন জিপের চাকায় বেঁধে কাকে প্রাহার রাজপথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে?

ফুচিক। অধ্যাপক হোরাককে।

বম্। [উন্মত্তের মত চীৎকার করে] কার ক্ষত-বিক্ষত লাশ প্যান্‌ক্রাট্‌স্ বন্দীশিবিরে গিয়ে পৌঁছুবে?

ফুচিক। অধ্যাপক হোরাকের। হয়তো সমস্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার।

বম্। ওয়েল্। গুড্ সাজেশন! [হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে] মার্চ টু প্যান্‌ক্রাট্‌স্।

[মিলিটারী ভ্যানের ভারী আওয়াজ কিছুক্ষণ। মঞ্চ অন্ধকার। ফুচিক আবার মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।]

ফুচিক। [গলা তুলে] কাট্। ওয়ার্কিং লাইট দিন।

[মঞ্চে সাধারণ আলো পড়ল। অভিনেতারা একটা সেট ভেঙে পরের সেট সাজাতে শুরু করলেন।]

প্যান্‌ক্রাট্‌স্। প্রাহার জার্মান কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প— প্যান্‌ক্রাট্‌স্! পেট্‌চেক্ ব্যাংকের বিল্ডিংটাকে দুভাগ করে

পাঁচ তলায় গেস্টাপো প্রধান ঘাঁটি বা কমিউনিস্টবিরোধী তদন্ত অফিস আর নীচের তলার ঘরগুলোয় জেলখানা প্যানক্রাট্স্। জার্মানরা বলতো, ঘরোয়া ফাটক। এখান থেকেই হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, রাজ-কর্মচারী, ডাক্তার চলে যেতেন বার্লিনে বেগার খাটতে বা কোবিলিসির বধ্যভূমিতে। তবু বীরত্ব আর ন্যায়ের ওপর যদি মানুষের কোনো শ্রদ্ধা থাকে তাহলে ওই জেলখানার মধ্যে বসে হাতে পায়ে শেকল পরে যারা হিটলারের 'রক্ত আর মাটি'-র নীতির বিরুদ্ধে নিঃশব্দে লড়াই করেছেন, শত্রুও তাঁদের প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হবে না। হাঁ, এ-ও একটা পর্যায়ের লড়াই। কয়েদি সেলগুলো যেন যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগের ট্রেঞ্চ। চারদিকে শত্রু ঘিরে আছে, গুলি বৃষ্টি হচ্ছে তবু কেউ আত্মসমর্পণের কথা একবারও ভাবছেন না।

বম্। সেট রেডি।

[পাশাপাশি দুটো সেট্ পড়েছে। প্যানক্রাট্স্ জেলখানার সেল আর পাশে শুধু চেয়ার-টেবিল ও কাগজপত্রে সাজানো কমিউনিস্টবিরোধী তদন্ত অফিস।]

ফুচিক। বাহ্। আপনারা তো দেখছি তদন্ত অফিস, জেলখানার সেট্-টেট্ সাজিয়েই ফেলেছেন। তদন্ত অফিসে আমরা কে কে থাকবো?

বম্। কমিশার জোসেফ বম্, তদন্ত অফিসের কর্তা ফ্রিড্রিখ আর গোটা দুয়েক এস. এস. সৈন্য।

ফুচিক। অগাস্তিনা ফুচিক?

অগাস্তিনা। [উইং-এর পাশ থেকে] আমি এখানে। ওরা আমাকে এখান থেকেই নিয়ে যাবে।

ফুচিক [ফ্রিড্‌রিখকে] এই যে স্যর ফ্রিড্‌রিখ, জার্মান অফিসার হলেই লাফ-ঝাঁপ মারতে হবে, গাঁক-গাঁক করে চেঁচাতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। নিজের শরীরের অবস্থা বুঝে যা করার করবে, কেমন? [মূল প্রসঙ্গে] মি. জেলিনেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ওরা ফুচিককে নিয়ে তুললো পেট্‌-চেক বিল্ডিং-এর পাঁচতলায়। ফুচিকের আসল পরিচয় না পেয়ে ওরা তখন ক্ষিপ্ত। ফুচিককে জেরা করছে জোসেফ বম্‌।

বম্‌। সংক্ষেপে বলো, তুমি কে?

ফুচিক। এর আগে বিস্তারিতভাবে অনেকবার বলেছি, আমি অধ্যাপক হোরাক।

বম্‌। মিথ্যে বলার শাস্তি মৃত্যু।

ফুচিক। সত্যি বলার পুরস্কার কি আলাদা?

বম্‌। [ঘুষি মেরে] খচ্চর। [ফ্রিড্‌রিখকে] এর কাছে যে পরিচয়-পত্র পেয়েছেন, কি নাম আছে তাতে?

ফ্রিড্‌রিখ। অধ্যাপক হোরাক।

বম্‌। খোঁজ নিন তো।

[ফ্রিড্‌রিখ ফোন করছে। বম্‌ সিগারেট ধরাচ্ছে।]

ফ্রিড্‌রিখ। [ফোনে] হ্যালো শুনুন, আপনাদের রেজিস্ট্রি বই দেখুন। নাম বলছে অধ্যাপক হোরাক।...আমাদেরও তাই মনে হচ্ছিলো ...শিওর? সেই ভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি তাহলে।

ধন্যবাদ। [ফোন ছেড়ে উঠে এসে] না, রেজিস্ট্রি করা নেই।

বম্। তার মানে জাল পরিচয়-পত্র ?

ফ্রিড্রিখ। নিশ্চয়ই।

বম্। আপনি কথা বলুন তো, আমি আসছি।

ফ্রিড্রিখ। [ফুচিককে] কে দিয়েছে এ পরিচয়-পত্র বলো ?

ফুচিক। পুলিশের প্রধান ঘাঁটি থেকে।

ফ্রিড্রিখ। শুইয়ে দাও।

[এস. এস. সৈন্যরা ফুচিককে শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরল। ফ্রিড্রিখ ফুচিকের দাড়ি টেনে ধরল। ফুচিক আর্তনাদ করছেন।]

বল্ আসল নাম কি ? কার সঙ্গে যোগসাজস আছে, জবাব দে ? তাদের নামধাম বল্, তা নাহলে মেরে ফেলবো।

[বম্ হাসতে হাসতে ঢুকল]

বম্। নো নো নো স্যর, মেরে ফেলবেন না। রাত দুপুরে খুন-খারাপিতে জড়াবেন না।

[ফ্রিড্রিখ তার হাতের মুঠোয় ফুচিকের বেশ খানিকটা ওপড়ানো দাড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বম্‌কে দেখিয়ে পৈশাচিক হাসি হেসে]

ফ্রিড্রিখ। দেখুন, আমার হাতে এক গোছা দাড়ি। উপড়ে নিয়েছি।

বম্। না না। ওর দাড়ি উপড়ে আপনি ভালো করেন নি। [হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে] দেখবেন ওর একটাও যেন মাটিতে না পড়ে যায়।

ফ্রিড্রিখ। [ভয় পেয়ে] কেন ?

বম্। যে কটা পড়বে চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে সেই কটা জুলিয়াস্ ফুচিক গজাবে। [প্রচণ্ড হাসি]

ফুচিক। [চিৎকার করে] না, মিথ্যে কথা।

বম্। অবুঝ হবেন না মি. ফুচিক।

ফুচিক। আপনাদের অভিধানে বিবেচক হওয়া মানে তো বিশ্বাস-ঘাতকতা।

বম্। বিশ্বাসঘাতকতা হলে আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই যেচে এখানে আসতে চাইতেন না ?

ফুচিক। যেচে এ-নরকে কেউ আসে না।

বম্। আপনি আছেন, আপনার স্ত্রী আসবেন না। উনিই তো বললেন, দয়া করে আর মারধর করবেন না, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই ও সব কথা বলবে। অন্তত আমার কথা ভেবে বললেও বলবে। [রক্ষীকে] এই যে, ভেতরে নিয়ে এসো তো ভদ্রমহিলাকে।

[রক্ষীর সঙ্গে অগাস্তিনা ঢুকলেন। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছেন। অগাস্তিনার চোখে জল।]

ফুচিক। [অসহ্য কষ্টে আপন মনে] রাত্রের এই ঘন অন্ধকার !. তবু মানুষের ভাঙা অস্থি পাঁজরের নীচে ভয়ার্ত মনের কোনে লুকিয়ে আছে নতুন এক পৃথিবীর আহ্বান ! যাঁরা শুনতে পায়, তাঁরা ভেঙে পড়ে না। বিশ্বাস রেখো, শত নিপীড়ন তাদের মারতে পারেনা।

বম্। [অগাস্তিনাকে] আপনি কিছু বলুন।

অগাস্তিনা। কি বলবো ?

বম্। যা বলবেন বলে এসেছেন।

অগাস্তিনা। কিছু বলবো বলে তো আসিনি। নিয়ে এলেন তাই এলাম।

বম্। আপনি একে চেনেন না?

[ফুচিকের দিকে জলভরা চোখে চেয়ে থাকেন।]

অগাস্তিনা। চিনি।

বম্। বাস্। যথেষ্ট। [ফুচিককে] দেখলেন তো।

অগাস্তিনা। ওঁকে চিনি জার্মান কারাগারের আর একজন চেক বন্দী হিসেবে, তার বেশি কিছু নয়।

[বম্ অসহ্য রাগে অগাস্তিনার মাথায় রিভলবার দিয়ে মারল। একটা সৈন্য তাঁকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। পেছনে বম্‌ও বেরিয়ে গেল।]

ফ্রিড্‌রিখ। [রক্ষীকে] সাঁড়াশি আনো।

[সাঁড়াশি এল। অন্য রক্ষীটাও ভতক্ষণে আবার ঢুকেছে।]

শুইয়ে দিয়ে হাত-পা চেপে ধরো।

[রক্ষীরা তাই করল। ফ্রিড্‌রিখ সাঁড়াশি দিয়ে ফুচিকের কাঁচা দাঁত টেনে তুলতে থাকে।]

বল্ তোদের সেন্ট্রাল কমিটির আর সব সভ্য কোথায়? ট্রান্সমিটারগুলো কোথায়? কোথায় ছাপাখানা? [একটা দাঁত টেনে তুলে ফুচিকের চোখের সামনে ধরে] এইভাবে সব কাঁচা দাঁত একটা একটা করে টেনে তুলবো।

ফুচিক। তবু শুনে নাও, অত্যাচার ক্লান্ত হবে, মৃত্যুও লজ্জা পাবে একদিন! কিন্তু কোনো খবর তোমরা পাবে না। [আচ্ছন্ন ভাবে] রাত কতো হলো! আমার প্রিয় প্রাহার কাফেগুলো বোধহয় সব বন্ধ হয়ে গেছে। প্রেমিক প্রেমিকা শেষ চুম্বন করে বাড়ি ফিরছে। [ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়] সবাই ফেরে, ফেরে না শুধু ইতিহাসের চাকা! [হঠাৎ স্বাভাবিক গলায়] কাট্ [মাইকের সামনে গিয়ে] তদন্ত অফিসের পর জেলখানা। জার্মান জেলখানার [জেলখানার সেট্ দেখিয়ে] ওই কুঠুরিগুলো দেখলে মনে হবে, নরকের শেষ স্তর। ওখানেও হাজার হাজার পুরুষ আর আর নারী পালা করে আসে, চলে যায় কিন্তু একটা পরিবর্তন হয় না। যে সংঘশক্তি সংগ্রামে নিবেদিত, শেষ জয়লাভে সুনিশ্চিত, সে থাকে অটুট হয়ে। সে সংঘশক্তি প্রকাশ করে সমগ্র জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের একতা আর ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের ঘৃণা। [চেঁচিয়ে] লাইট প্লীজ।

[জেলখানায় আলো পড়ল। দেখা গেল ভেতরে জোসেফ পেসেক্ আর কারেক্ আগে থেকেই আছেন। ফুচিক তাদের লক্ষ্য করে]

আচ্ছা জোসেফ্ পেসেক্ আর কারেক্ তো ভেতরেই থাকবেন?

পেসেক্। হাঁ।

কোলিন্স্কি। [সেলের সামনে দাঁড়িয়ে] আমি সেন্ট্রি কোলিন্স্কি।

ফুচিক। ঠিক আছে। কমিশার জোসেফ্ বম্?

বম্। [উইং-এর পাশ থেকে মাথা বের করে] আছি।

ফুচিক। ক্রিড্‌রিখ, সপ্‌পো আর্ ওয়েস্‌নার?

সপ্‌পা। [উইং-এর পাশ থেকে] আমরাও এখানে আছি। দুটো এস্. এস্. সৈন্যও আছে, আপনাকে সেলে নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে।

ফুচিক। গেস্টাপো প্রধানঘাঁটিতে শুনানির পর ওরা আমাকে নিয়ে এলো প্যানক্রাটস্ জেলখানার ২৬৭ নম্বর সেলে। তখন জ্ঞান ফিরে আসছে। দেখলাম, সেলের দরজা খুলে যাচ্ছে।

[সেলের দরজা খুলল কোলিন্‌স্কি। জোসেফ্ পেসেক্ আর কারেক্ তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ওরা উঠে দাঁড়ালেন।]

পেসেক্। [চিৎকার করে] তৈয়ার। ২৬৭ নম্বর সেল। দুজন কায়েদি। সব ঠিক হ্যায়।

[সেলের মধ্যে একটা খড়ের গদি। এক পাশে একটা পায়খানার বড় মগ। আর একটা তাকের ওপর কয়েদিদের এটা-ওটা ছড়ানো। স্কোরেপা ফুচিককে টেনে ভেতরে এনে খড়ের গদির ওপর শুইয়ে দিল]

সপ্‌পা। শরীরটা কি খুব ফুলেছে?

স্কোরেপা। [ফুচিকের গায়ে হাত দিয়ে] হাঁ।

সপ্‌পা। ওদের বলে দাও, রাতে যেন সেঁক দিয়ে দেয়।

স্কোরেপা। এই যে, আর একটা রইলো, রাত্তিরে সেঁক দিতে হবে, বুঝেছিস?

পেসেক। হাঁ, দেবো বৈকি।

সপ্‌পা। [স্কোরেপাকে] ভোর পর্যন্ত টিকবে?

স্কোরেপা। মনে হয় না।

[ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফ পেসেক আর কারেক্‌ খাওয়া ফেলে ফুচিকের পাশে ছুটে এলেন। জোসেফ পেসেক নাড়ি দেখলেন। কারেক্‌ নাকের কাছে হাত নিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করলেন।]

পেসেক। কারেক্‌, সেলে আমরা থাকতে লোকটা মরে যাবে? চেকোশ্লোভাকিয়ার সংগ্রামী মানুষগুলোকে ওরা বাইরে মারছে তারপর আধমড়া অবস্থায় জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তো এখানে আর কোনো কাজ নেই। আমরা এদের সেবা করতে পারি। বাঁচিয়ে তুলতে পারি। এইভাবে এখানে থেকে আমরা সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবো।

কারেক্‌। নিশ্চয়ই।

পেসেক। দেখ দেখ, চোখে মুখে জল দে। আমি খাবার আনছি।

[কারেক জল এনে চোখে মুখে দিলেন। পেসেক তাঁর খাবার থালাটা নিয়ে এলেন।]

কারেক্‌। বাবা, লোকটা মরে গেছে।

পেসেক। [চিৎকার করে] মরে যাওয়াটা আজকে আর কোনো

খবর নয় কারেক্, বেঁচে-থাকাটাই দুর্ঘটনা। হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে। দেখ, ভালো করে দেখ।

কারেক্। [ফুচিকের বুকের ওপর কান পেতে পরীক্ষা করে] না, মারা গেছে বাবা।

পেসেক। [আপন মনে] অন্ধকারে এলো, অন্ধকারেই চলে গেলো! কারেক্, তাহলে আর আমরা ওর জন্যে একটু প্রার্থনা করি।

[ফুচিকের পাশে হাঁটু পেতে বসল।]

পেসেক ও কারেক। [উপাসনার সুরে]

মন আনন্দে আত্মা মেলেছে পাখা।
ঊর্ধ্ব স্বর্গে যাত্রা শুরু যে তাহার যাত্রা॥
চিরতরে যেথা রাত্রির অবসান।
চিরভাস্বর দিবার জ্যোতিতে॥
যেথা জ্বলে তারা আকাশে অনির্বাণ।
যীশু সেই জন—তিনিই স্বয়ং যীশু।

ফুচিক। [অস্ফুটে] জল।

[ওরা দুজনে থামলেন। ফুচিকের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।]

—জল।

কারেক্। [সোচ্ছ্বাসে] বাবা, বেঁচে আছে! জল চাইছে!

[কারেক ছুটে জল নিয়ে এলেন। পেসেক ফুচিকের মাথাটা কোলে তুলে ধরলেন। কারেক ফুচিকের মুখে জল দেন।]

কারেক্। জল নাও। এই যে জল।

ফুচিক। [জল খেয়ে] আহ্! শীতল ঝর্ণার জল! রোক্লান পাহাড়ের নীচে বন-বিভাগের কর্তার বাড়ির কাছেও একটা

ঝর্ণা আছে! বনের পাতা খসে পড়ছে। ঝর্ণার ঝিরঝিরানি গান! বুকের ওপর ঝর্ণা! চোখে ঘুম!

পেসেক। ঘুমুতে দে, ঘুমোক। আয়, আমরা খেয়ে নিই। [পেসেক ও কারেক্ আবার গিয়ে খেতে বসলেন। সেন্ট্রি সেলের দরজা খুলছে আবার। পেসেক বিষম খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন।] তৈয়ার। ২৬৭ নম্বর সেল। তিনজন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।

[বম্, সপ্‌পো আর ফ্রিড্‌রিখ সেলের মধ্যে এসে দাঁড়াল।]

বম্। কি বুড়ো, জ্ঞান ফিরেছে?

পেসেক। হাঁ।

বম্। [কারেক্‌কে] এই যে শয়তানের ছানা, ওকে তুলে বসিয়ে দে তো।

[কারেক ফুচিককে তুলে আগলে বসল।]

কি হে বিপ্লবী, তোমার লীলাখেলা তো সাঙ্গ। এবার নিজেকে বাঁচাও। [একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে] কিছু বলো।

ফুচিক। সিগারেট খাইনা।

পেসেক। সিগারেট টানতে পারেনা। মুখের মধ্যে দলা দলা জমাট রক্ত।

ফ্রিড্‌রিখ। [লাথি মেরে পেসেককে ফেলে দিয়ে] তোকে কে ওকালতি করতে বলেছে রে শুয়োরের বাচ্চা।

ফুচিক। শোনো অফিসার, বুট-পরা পায়ে লাথি মেরে সত্তার কণ্ঠরোধ করা যায় না।

[বম্, সপ্‌পা আর ফ্রিড্‌রিখ এক সঙ্গে হাসল।]

ফ্রিড্‌রিখ [আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট হঠাৎ ফুচিকের ক্ষতের মধ্যে চেপে ধরে] দগদগে ক্ষতের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দিলে কি সত্তার কণ্ঠরোধ হয় ?

কারেক্। [মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে] না, আমি ধরে থাকতে পারবো না।

সপ্‌পা। [কারেকের পেছনে চলে গেল] এই শালা হারামির বাচ্চা, বসে থাক চুপ করে। [কারেকের চোখের ওপর জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে]

ফুচিক। পিতৃভূমি চেকোশ্লোভাকিয়া এখন ক্রুশে বিদ্ধ। সেলের সামনে জার্মান রক্ষী। বাইরে রাজনৈতিক নিয়তি বিশ্বাস-ঘাতকতার সুতো কাটছে। কিন্তু তোমরাই বলো, চোখ মেলে তাকাতে মানুষের কতো শতাব্দী লাগবে ? আগামী দিনের পথে এগিয়ে যেতে কতো সেল মানুষকে পেরোতে হবে ? হে নেকড়ের খৃস্ট-শিশুর দল, মানুষের মুক্তি-পথের এই বাধা কবে দূর হবে ?

বম্। কি করবে ব্রাদার, মুক্তি-পথের চেক পোস্টে দাঁড়িয়ে কমিশার জোসেফ বম্।

[ওরা তিন জন প্রচণ্ড শব্দ করে হাসল।]

মুক্তির গাড়িটা আমরা পথের মধ্যেই থামিয়ে দিয়েছি।

ফুচিক। না, থেমে গেছি শুধু আমি !

ফ্রিড্‌রিখ। কমিউনিজিমের জয়ে এখনও তোমার বিশ্বাস ?

ফুচিক। তাই তো স্বাভাবিক।

সপ্‌পা। কি বললো?

বম্‌। বলছে, রাশিয়া যে জিতবে তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই? জোসেফ্‌ স্তালিন ওকে ফোনে অভয় দিয়েছেন।

[তিন জনে সশব্দে হাসল]

ফুচিক। [জ্বরের ঘোরে] তোমাদের ভালোবেসেছি হে জনগণ, তাই আমি নেমেছিলাম সংগ্রামে।

ফ্রিড্‌রিখ। [কারককে] কি বলছে?

কারেক্‌। বোধহয় জ্বরে ঘোরে ভুল বকছে।

ফুচিক। বাবা, মা, বোন, আমার গাস্তা আর কমরেডরা, যদি মনে করো, চোখের জলে তোমাদের বিষাদের ম্লান ধুলো ধুয়ে যাবে তবে কেঁদো কিন্তু আমার নামের সঙ্গে যেন বিষণ্ণতা না জড়িয়ে থাকে, এই আমার শেষ অনুরোধ। [অজ্ঞান হয়ে কারেকের কোলে ঢলে পড়লেন।]

বম্‌। [ঝুঁকে দেখে নিয়ে সপ্‌পাকে] ডাক্তার ওয়েসনারকে খবর দিন। অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয়, কাল সকালের আগেই টেঁসে যাবে।

[ওরা বেরিয়ে যায়। পেসেক ও কারেক ফুচিকের চোখমুখে জল দিয়ে সজীব করে তোলার চেষ্টা করেন।]

পেসেক। [চোখ মুছতে মুছতে] শুনছো, ওঠো, ভেঙে পড়ো না। কাল পয়লা মে। আমি আর কারেক তোমাকে নিয়ে পয়লা মে-র গান গাইবো। কাল ছুটির দিন, সর্বহারাদের স্মৃতি উৎসব, আনন্দের দিন—মে ডে!

ফুচিক। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু জল খেলে বোধহয় আরাম হবে।

কারেক। [পেসেকের কানে চুপি চুপি] আর জল নেই বাবা?

পেসেক। [শৌচের মগ দেখিয়ে] ওটা কি?

কারেক। ওতে শৌচের জল।

পেসেক। এ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারের আশীর্বাদে ও-ই আমাদের কাছে স্বর্গের অমৃত। নিয়ে আয়।

[কারেক জল এনে ফুচিককে খাইয়ে দিলেন।]

ফুচিক। আহ্‌, আমি মরে যাচ্ছিলাম।

পেসেক। না, মরবে কেন। বাঁচতে চাও বলেই তো লড়ছো। কাল পয়লা মে। মনে পড়ে না, প্রতি বছর পয়লা মে-র ভোর রাতে আমরা শহরতলীতে জেগে উঠে তৈরী হতাম।

ফুচিক। পয়লা মে! ভোর হচ্ছে! মস্কোর পথে পথে প্যারেডের জন্মে প্রথম দল বোধহয় রেডস্কোয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে!

কারেক। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজাদীর জন্মে লড়বে শেষ লড়াই।

পেসেক। তাঁদের একজন হয়ে মরতে পারায় অনেক বেশি আনন্দ!

ফুচিক। হাঁ, শেষ লড়াইয়ের একজন!

[সেলের দরজা খুলছে। ডাক্তার ওয়েস্‌নার আর সপ্‌পো দেখা দিল।]

পেসেক্‌। [উঠে দাঁড়িয়ে] তৈয়ার। ২৬৭ নম্বর সেল। তিনজন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।

[ওরা ভেতরে এল।]

ওয়েস্‌নার। [ফুচিককে পরীক্ষা করে রীতিমতো বিরক্তভাবে সপ্‌পাকে বলল] ও মশায়, আপনা-আপনির মধ্যে এ রকম রসিকতার কি মানে হয় ?

সপ্‌পা। কেন ?

ওয়েস্‌নার। অবস্থা যা বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম, এসে দেখবো লাশ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। তাই ডেথ্‌-রিপোর্ট তো কাল রাত্তিরেই আমি রেডি করে রেখেছি।

সপ্‌পা। এখন কি দেখছেন, অবস্থা আরো খারাপ ?

ওয়েস্‌নার। আরো খারাপ ! মরে গেছে, তারপর আরো খারাপ ? এই না হলে জেলের কর্তা।

সপ্‌পা। আপনি প্রায়ই আমাকে এই রকম অপমান করেন।

ওয়েস্‌নার। আপনি প্রায়ই এই রকম বোকা-বোকা কথা বলেন।

সপ্‌পা। আপনি তো মশাই ভারি ইয়ে— ।

ওয়েস্‌নার। ইয়ে আবার কি, ইয়ে ? ডাক্তারের কথার ওপর কথা বলেন। চোখ রাঙান। দেবো ওপরে ঠুকে, ভালো হবে ? আমি বলছি শালার ঘোড়ার মতন তাকৎ আর ওরা আমাকে দিয়ে ডেথ্‌-রিপোর্ট লেখাচ্ছে।

সপ্‌পা। কেউ লেখায়নি, নিজেই লিখেছেন। রুগীর ঘোড়ার মতন তাকৎ, আপনি লিখলেন কেন ? ডাক্তারি দেখাচ্ছেন। দেবো ওপরে ঠুকে, ভালো হবে ?

ওয়েস্‌নার। [নরম] নিজেদের মধ্যে ও রকম করেন কেন, আপনি তো ভারি ইয়ে।

সপ্‌পা। ইয়ে আবার কি, ইয়ে ? বেআইনি কাজ করবেন আবার জেলের কর্তাকে চোখ রাঙাবেন !

ওয়েস্‌নার। হয়ে গেলো তো, হয়ে গেলো তো। চোখ আমিও রাঙালুম, আপনিও একবার রাঙালেন। আমিও সত্যি সত্যি ওপরে ঠুকে দিই নি, আপনিও দেবেন না। নিজেদের মধ্যে একটা ইয়ে কি ভালো? চলুন। [যেতে যেতে] আমাদের কি মশায় বলুন না, কয়েদীরা বাঁচলেই বা আমাদের কি, মরলেই বা আমাদের কি? আপনি আপনার কাজ করুন, খাবার-দাবার পাঠিয়ে দিন। আমি অসুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ডাক্তার হিসেবে পীড়িতের সেবা করা আমার পবিত্র কর্তব্য, এটা তো মানেন?

[কারেক জেলের গরাদ ধরে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ইন্টারন্যাশনাল গাইছে সে। ফুচিক পেসেক্‌কে ধরে ধীরে ধীরে গরাদের কাছে এসে দাঁড়াল। ইন্টারন্যাশনালের সুর বড় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওরি মধ্যে অন্য সেল থেকে অত্যাচারিতের তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে। কোলিন্‌স্কি এসে গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাবধানে এদিক-ওদিক দেখে নিল।]

কোলিন্‌স্কি। [ফিস্ ফিস্ করে] কি ব্যাপার, ফুর্তি কিসের?

পেসেক্। জানো না, কাল যে মে দিবস।

কোলিন্‌স্কি। এই [ফুচিককে দেখিয়ে] নতুন কমরেডের খবর কি? ডাক্তার বলে গেলো, খাবার-দাবার দিন, অসুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতো দয়া কিসের?

কারেক। ডাক্তার হিসেবে পীড়িতের জন্য পবিত্র কর্তব্য।

[জোসেফ্ পেসেক্, কারেক ও ফুচিক হাসতে গিয়েও কোলিন্স্কির ইঙ্গিতে সামলে নিলেন।]

পেসেক্। কাল হয়তো গুলি করবে। মরার যন্ত্রণা যাতে সজ্ঞানে ভোগ করতে পারে তাই চাঙ্গা করে তুলতে চায় হয়তো।

কোলিন্স্কি। [ফুচিককে] ভয় পাচ্ছো?

ফুচিক। কিসের ভয়?

[কোলিন্স্কি আরো এগিয়ে গিয়ে ফুচিকের হাতের ওপর হাত রেখে।]

কোলিন্স্কি। মেরে ফেলতে তো পারেই। আবার হয়তো সুযোগ আসবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, সবাই মুক্তি পাবে, এমনও হতে পারে।

ফুচিক। [বিস্মিত] কে তুমি?

কোলিন্স্কি। জার্মান বলে জাত ভাঁড়িয়ে এ-জেলখানায় ঢুকেছি। আমি মোরাভিয়ার এক পুরণো বংশের ছেলে। চেক। এ্যাড্লফ্ কোলিন্স্কি। হ্রাদেক ক্রালোভে কাজ করতাম। অনেক চেষ্টা করে তোমাদের কাছে এসেছি। অবাক হচ্ছো? এখানে আমার মতো আরো আছে। [হঠাৎ মুখে হিস্ করে শব্দ তুলে] শুয়ে পড়ো। [ওরা শুয়ে পড়তেই কোলিন্স্কি চেঁচাতে শুরু করল।] এই শালা লাল শয়তান, সেলের মধ্যে রাত দুপুরে বিপ্লবের ক্লাস হচ্ছে? দেবো শালা নিতম্বে ছ্যাঁকা দিয়ে। শুয়ে পড়্। [ভালো করে বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে] কুত্তার বাচ্চা সপ্পা।

[ওরা আবার মাথা তুললেন]

শোনো, ওরা যদি মেরেই ফেলে, কারুর কাছে কোনো খবর দেবার আছে? কাউকে কিছু লিখে জানাতে চাও?

[ফুচিক অবাক হয়ে কোলিন্‌স্কির দিকে চেয়ে থাকে।]

কোলিন্‌স্কি। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও। [মোজার ভাঁজ থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল বের করে দিল। ফুচিক তা হাত বাড়িয়ে নিয়েই লুকিয়ে ফেলল।] লিখে দাও, পৌঁছে দেবো। নাৎসীদের চাকরিতে আমরাও আছি কমরেড, এইভাবে কাজ করবো বলেই আছি।

পেসেক্‌। বাইরের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগই নেই।

কোলিন্‌স্কি। এবার হবে।

ফুচিক। বাইরে বহু কমরেডের জীবন এখনো বিপন্ন।

কোলিন্‌স্কি। কাকে কোথায় খবর দিতে হবে বলে দাও।

সপ্‌পা। [বাইরে থেকে চিৎকার করে] কে কথা বলছে ওখানে?

কোলিন্‌স্কি। [মুখে আবার তেমনি শব্দ করে সকলকে সাবধান করে দেয় ও চেঁচিয়ে ওঠে] হারামি, তখন থেকে সংগীত হচ্ছে সেলের মধ্যে? রোমিও-র বাচ্চা, মহব্বতের আর জায়গা পাওনি।

[সপ্‌পা এগিয়ে এল।]

সপ্‌পা। কি হয়েছে?

কোলিন্‌স্কি। শালাদের সংগীতচর্চা হচ্ছে হুজুর।

সপ্‌পা। সংগীত!

কোলিন্‌স্কি। দেখুন না আস্পর্ধা।

সপ্‌পা। কাকে দেখবো?

কোলিন্স্কি। [বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে] আজ্ঞে ?

সপ্পা। আস্পর্ধা তোমারই বা কম কিসে ? [হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে] তুমি আছো কি করতে শালা, সংগীত শুনতে ? না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনো যুবতীর সর্বনাশ করছিলে ? একটি ঘুষি ঝাড়বো, তোমার জান আর চাকরি-বাকরি সব একসঙ্গে খতম করে দেবো, বুঝেছো ?

ফুচিক। [স্বাভাবিক গলায়] কাট্—কাট্। লাইট কাটা। [মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।] সপ্পা ভুল করেছিলো। কোলিন্স্কির প্রাণ আর চাকরি খতম করলেই তো হতো না, তাঁর মনুষ্যত্ব, আদর্শবোধকেও মেরে ফেলতে হতো। কোলিন্স্কি সেই লোক, যে সচেতনভাবে স্বেচ্ছায় শত্রুর দলে এসে ভিড়েছে। সে নাৎসী বাহিনীর ভাড়াটে সৈন্য নয়। প্রতি মুহূর্তের বিপদের সম্ভাবনা তাকে আরো শক্তিমান করে তুলেছিলো। আর মিরেক ?

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। শুধু একটি আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়ে মিরেক। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। পা ভাঙা। ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্লাস্টার-করা ডান হাতটা দড়ি দিয়ে গলায় ঝোলানো।]

মিরেক। না, নাৎসী অত্যাচারে মুখ আমি খুলতাম না। কিন্তু দেখলাম রেনেককে—ইউনিয়ন আর পার্টি-সেক্রেটারি রেনেক। দেখলাম উত্তর বোহেমিয়ার খনিমিস্ত্রি পার্টির জেলা-সেক্রেটারি ভাসেক্ রেজেক্‌কে। গেস্টাপো গোয়েন্দা অফিসে ওরা কেন ?

নাৎসী অফিসারের পোষাক পরে কি করছে ওরা? একি সত্য, না অভিনয়? এই কি আজকের চেকোশ্লোভাকিয়ার আসল রূপ? ক্ষুধা আর ভালোবাসা, মৃত্যু আর সুখ একই অন্ধ আবেগে পরিচালিত? আমি দেখেছি, প্রেমিক বিপ্লবী, প্রেমিকা হিটলারের চর। খাঁটি কমিউনিস্ট, তার ভাই বিশ্বাসঘাতক। চমৎকার! [হতাশায় ভগ্নকণ্ঠে] য়েনেক আর ভালেকরাই অন্ধকারে আমার মুখোমুখি হিটলারের প্রতিনিধি। তখন আমি হেরে গেলাম। নীচে নেমে গেলাম। এতোদিন ওরা আঘাত করেছে আমার গায়ে, সেদিন গুঁড়িয়ে গেলো আমার মনোবল। আমি বলে ফেললাম ঐতিহাসিক পাভেল ক্রোপাচেক্‌কে আমি চিনি। তোমরাও চেনো, হয়তো আজ আর চিনতে পারবো না। আমি বলেছি, ডাক্তার য়েনেক্‌স্টাইথ্‌, লেখক ভ্লাদিমির ভাঙ্কুরা, অধ্যাপক কেল্‌বার আর তার ছেলে, ফ্রেডারিখ ভাক্লাবেক, জিনড্রিক্‌ এল্‌বল্—সবাইকেই আমি চিনি। আমি এ্যানিকে ধরিয়ে দিলাম ওদের হাতে। আর [রুদ্ধকণ্ঠে] হিটলারের রক্তমাখা হাতের মুঠোয় লিডাকে। লিডাকে আমি ভালোবাসতুম, তা-ও। আমি আর পারছিলুম না। দুঃসহ যন্ত্রনা আর শূন্যতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি আর সব কিছু ভুলে গেলাম।

[মিরেক অন্ধকারে অদৃশ্য হল। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ফুচিক।]

ফুচিক। হতাশ হবার কারণ নেই বন্ধু, মিরেকদের হাতে ইতিহাসের উপসংহার লেখা হয়না। মধুর আশাবাদী উপসংহার লেখেন

জুলিয়াস ফুচিক, এ্যাড্‌লফ্ কোলিন্‌স্কিরা। তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ শুধু নির্দিষ্ট হয়ে থাকে মৃত্যুর দিকে। বধ্যভূমির দিকে যেতে যেতে তাঁরা রেখে যান রক্তাক্ত পায়ের ছাপ, আর সেই পায়ের ছাপ ধরেই আমরা পৌঁছে যাই নতুন জীবনের সিংহদ্বারে। [হঠাৎ সময় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন।] কিন্তু রাত কতো হলো? [ঘড়ি দেখেন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উদ্দেশ্যে] ওহে, তোমরা একবার এদিকে এসো না সবাই।

[সকলে বেরিয়ে এসে ফুচিককে ঘিরে দাঁড়াল।]

ভাবছিলাম, এখানেই আজকে শেষ করা যাক না?

স্মেতোন্‌ঝ। কিন্তু মধুর উপসংহার যাঁরা লেখেন তাঁদের পরিণতি একবার দেখাবেন না? মিরেকের বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত নিয়ে দর্শকরা বাড়ি ফিরবেন?

ফুচিক। [মুচকি হেসে আর সকলকে] মধুর উপসংহার দেখাবার ওর এতো গরজ কেন বুঝলে না তো তোমরা? এই এপিসোড্ বাদ গেলে স্মেতোন্‌ঝের যে সবই চলে গেলো।

[সকলে একসঙ্গে হেসে ফেলল।]

স্মেতোন্‌ঝ। কি যে বলেন। আমার কি। বাদ দিন না, বাদ দিয়ে দিন।

ফুচিক। রাতও হয়েছে তাছাড়া ফ্রিড্‌রিখ, কোলিন্‌স্কি ওদের আজ তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে চাইছিলুম।

কোলিন্‌স্কি। না না, সে কি কথা। আপনি শেষ করুন।

ফুচিক। [আবার ঘড়ি দেখে] সব মিলিয়ে কতোক্ষণ টানলুম?

কোলিনস্কি। [ঘড়ি দেখে যতোক্ষণ অভিনয় চলল ঠিক সেই সময়টাই বলল।]

ফুচিক। ঠিক আছে। করো। বন্দীশালার মধ্যেও ফুচিকরা মে-দিবসের উৎসব পালন করেছিলেন। ১৯৪৩ সালের পয়লা মে। আদর্শবিশ্বাস আর মনোবলের সে এক আশ্চর্য কাহিনী! জোসেফ, পেসেক, কারেক, চলো আমরা তাহলে সেলের ভেতরে যাই।

[ওরা সকলে পা বাড়াল।]

কোলিনস্কি। [হেসে] আমি আমার জায়গায় ঠিক দাঁড়িয়ে আছি।

ফুচিক। [ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে] তাই তো চাই। সবাই মিলে মিরেকের মতো প্রাণের আবেগে জায়গা থেকে সরে গেলে তো বিপদ।

[সকলে এ-কথার শ্লেষার্থ বুঝতে পেরে হেসে উঠল। ফুচিকরা ততোক্ষণে সেটের মধ্যে ঢুকে গেছেন।]

লাইট।

[সেটে আলো পড়ল। পেসেক, কারেক ও ফুচিক অভিনয় শুরু করলেন। ওঁরা ভেতরে বসে কফি আর রুটি খাচ্ছেন। বাইরে কোলিনস্কি টহল দিচ্ছে।]

তাড়াতাড়ি করো। আজ কাজ আছে। মে-দিবস আজ, মনে আছে তো?

[স্মেতোনস্ক তখন সমস্ত সেলের সামনে ঘুরে ঘুরে কয়েদিদের কফি, রুটি, জল ইত্যাদি দিচ্ছিল। বাইরে থেকে তার ছড়ার মত সুর শোনা যাচ্ছে: কফি-রুটি-জল চাই, জল-রুটি-কফি? কফির পট

আর ব্যাগভর্তি রুটি নিয়ে স্মোতোন্‌ঝ দৌড়ে ঢুকল। হঠাৎ ফুচিকদের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে।]

স্মোতোন্‌ঝ। এই যে হাতে লাল-ফিতে বাঁধা লাল শয়তান, আর কফি-রুটি-জল চাই, জল-রুটি-কফি? [বেশ খুসি মেজাজে] জানো তো, আজ পয়লা মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।

কারেক। [হাত তুলে] লাল সেলাম কমরেড।

স্মোতোন্‌ঝ। [রাগের ভান করে] তবে রে শালা বাচ্চা শুয়োর। [কারেকের দিকে একটা রুটি ছুঁড়ে মারল] আমাকে বলে লাল সেলাম।

[ওরা তিনজনেই হাসল।]

লাল সেলাম নেহি, বোল্ মে-ডে সেলাম। ফুয়েরারের হুকুম, মে-উৎসব হবে, তবে সর্বহারার উৎসব-টুৎসব না, শ্রমিক দিবস।

কারেক। তাই তোমার এতো ফুর্তি?

স্মোতোন্‌ঝ। তুমি শালা মারের চোটে স্যাণ্ডউইচ্ হয়ে ফুর্তি করতে পারো আর আমি ফুর্তির দিনে ফুর্তি করতে পারি না। [ফুচিকদের] কি অন্যায় কথা বলুন তো?

ফুচিক। খুব অন্যায়।

স্মোতোন্‌ঝ। [কারেককে] হলো? খুব অন্যায়। [ফুচিককে] ভেরি গুড্। আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড্।

[সকলে হাসছে।]

কফি-রুটি-জল চাই, জল-রুটি-কফি?

পেসেক্। দাও না, আর একটু কফি দিয়ে যাও। [নিজে কফি নিয়ে

বাঁ হাতে ফুচিকের কাপ এগিয়ে ধরে] একেও দাও।

[ফুচিককেও কফি দিল স্মেতোন্ঝ।]

কারেক। আর একটা রুটি হবে ব্রাদার, রুটি ?

স্মেতোন্ঝ। কি রকম বেইমান দেখেছেন ? [রুটি ছুঁড়ে দিয়ে] কেন দিলুম বল্ তো ?

কারেক। তুমি বোধহয় আমাকে ভালোবেসে ফেলেছো।

স্মেতোন্ঝ। ঘোড়ার ডিম করে ফেলেছি।

কারেক। তাহলে ?

স্মেতোন্ঝ। [কোলিনস্কিকে দেখে নিয়ে] ওটা আমার মে-দিনের উপহার রে গাড়ল, মে দিনের উপহার।

[স্মেতোন্ঝ আবার ছড়ার সুরে কফি-রুটি বিলি করতে অন্য সেলের দিকে চলে গেল। ফুচিকরা যখন খাচ্ছেন তখনও বাইরে তার গলা শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই স্মেতোন্ঝ আবার ঢুকল। কারেকের দিকে আরো একটা রুটি ছুঁড়ে দিয়ে গেল। কারেক লুফে নিল।]

খাও দাও আর শালা ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ গাও।

[স্মেতোন্ঝ চলে গেল। দুটো সৈন্য নিয়ে ঢুকল সপ্পা।]

সপ্পা। [বিশ্রী চিৎকার করে] দরওয়াজা খোল্।

[কোলিনস্কি দরজা খুলে দিল। সেই সঙ্গে চারদিক জুড়ে যেন অসংখ্য দরজা খোলার শব্দ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।]

পেসেক। [উঠে দাঁড়িয়ে] তৈয়ার। ২৬৭ নম্বর সেল। তিন জন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।

[তখনও দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে আর একের পর এক ঘোষণা শোনা যাচ্ছে : 'তৈয়ার। ২৬৮ নম্বর সেল। পাঁচজন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।..... তৈয়ার ২৬৯ নম্বর সেল। তিন জন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।..... তৈয়ার ২৭০ নম্বর সেল। দু জন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।' এ-ঘোষণা আরো কিছুক্ষণ চলতে পারে। কারেক তখন তার ভাঙা পা নিয়ে হামা-গুড়ি দিতে দিতে সেলের সামনের খোলা চত্বরে বেরিয়ে এল। ফুচিকও পেসেককে ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। এদিক ওদিক থেকে অন্যান্য সেলের কয়েদিরাও একে একে জড়ো হতে থাকে। কারে-কের মত কারুর পা ভাঙা। বসে পা টেনে টেনে আসছে। কারুর হাতে প্লাস্টার। কারুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ। স্কোরেপা ও স্মাটি একজনকে নিয়ে এল স্ট্রেচারে করে। বিভিন্ন সেলের সেন্ট্রি-রাও এসে সৈন্যদের পাশে লাইন করে দাঁড়াল। স্মাটি ও স্কোরেপা স্ট্রেচার নিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল।]

সপ্‌পা। [কয়েদিরা সব এসে গেলে] ব্যায়াম শুরু করো এবার

[সপ্‌পা বেরিয়ে চলে গেল।]

ফুচিক। বন্ধুগণ, যদিও এখন আমাদের ব্যায়াম করার সময় কিন্তু প্রাহার পথে পথে বছরের পর বছর আমরা এই দিনটিতে অন্য কারণে মিলিত হতাম। আজ পয়লা মে। তাই আজ আমরা এখানেও নতুন কিছু করতে চাই। রক্ষীরা দেখুক আর না দেখুক, আমরা গ্রাহ্য করি না।

[এই সময় স্মেতোন্‌স্কি এসে স্মার্টি ও ক্লোরেপার পাশে দাঁড়াল।]

আজ আমরা নাচ-গানের মধ্য দিয়ে মে ডে-র উৎসব পালন করবো। আপনারাও সবাই আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। এখন জেলখানার সবচেয়ে প্রবীণ কয়েদি জোসেফ্ পেসেক প্রথমে গাইবেন ফসল কাটার গান। আমরা সবাই মিলে নাচবো।

[জোসেফ পেসেক গান ধরলে অনেকেই তাঁর সঙ্গে গলা মেলাবে আর যারা শারীরিক দিক থেকে সমর্থ তারা সকলেই ফুচিকের সঙ্গে ফসল-কাটার মূকাভিনয় করবে। এইভাবে নাচ-গান শেষ হলে কয়েদিরা সবাই হাততালি দেবে। স্মেতোনস্কিও ভুলে তাদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে ফেলে। রক্ষীরা তার দিকে তাকাতেই সে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে এবং তার যত নষ্টের গোড়া হাত দুটোকে কোথায় যে লুকোবে তা ভেবে পায় না। প্রথমে বুকের ওপর আড়া-আড়ি করে রাখে, তারপর পেছনে,

শেষে প্যাকেটের পকেটে হাত দুটো গলিয়ে দিয়ে স্বস্তি পায়। কয়েদিরা তাতে মজা পেয়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে।]

আজ আমাদের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, কারখানার গান।

[জোসেফ্ পেসেক গান ধরলেন। কুচিকরা নাচ শুরু করলেন। এই গানের সময় রক্ষীরাও যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবার চোখমুখ আশায় উজ্জ্বল। শরীরে এক উদ্দীপনা। অনুষ্ঠান শেষে আবার দীর্ঘস্থায়ী হাততালি।]

এই আমাদের পয়লা মে-র উৎসব। উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বলতে চেয়েছি, সুখী সমৃদ্ধ মানবসভ্যতা গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে চলেছে কৃষকের কাস্তে আর শ্রমিকের হাতুড়ি। কাস্তে আর হাতুড়িই শ্রমের প্রতীক—সুস্থ সভ্যতার গ্যারান্টি। তাই পয়লা মে জিন্দাবাদ!

কয়েদিরা। পয়লা মে জিন্দাবাদ!

[জেল-ঘড়িতে দশটা বাজল।]

কোলিনস্কি। দশটা বাজে। সবাই সেলে যাও এবার। পা চালাও, পা চালাও।

[কয়েদি ও রক্ষী সবাই একে একে চলে গেল। জোরেপা ও স্মার্টি স্ট্রেচারের কাছে যেতে যেতে]

স্মার্টি। শালাদের বুকের পাটা আছে মাইরি। সেলে পোরো, পেটাও আর মেরেই ফেলো, ডোণ্ট্ পরোয়া। যা বলবে তা বলবেই। ময়দানেও বলবে, সেলের মধ্যেও বলবে। [হঠাৎ গলা

নামিয়ে বাহাদুরি নেবার ভঙ্গিতে] আমার শ্বশুরের ছোটো ছেলে, মানে বউর ছোটো ভাই, সে বিচ্ছুও তো শুনেছি এদের দলে।

স্কোরেপা। [ধমক দিয়ে] চুপ।

[স্মার্টি ভয় পেয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে।]

বাইরে এসব কথা বলতে নেই। বউর ছোটো ভাই ওদের দলে, হঠাৎ দেখবি ফাঁসির দড়িখানা তোর গলে !

স্মার্টি। [কাঁদো কাঁদো] তোকে যে বলে ফেললাম ? কিছু হবে না তো ? হ্যাঁরে, তুই কি বাইরের লোক ?

স্কোরেপা। [বিজ্ঞের মত] আমি যে ঠিক কি রকম লোক তা আমিও জানি না। তাহলেও বলবি না। আমাকে কিছু বলতে শুনেছিস ? তুই তো আমার নিজের লোক। আমাকে এই ভিন্‌দেশে বদলি করে দিয়েছে বলে আমার বউ যে দিনে দুবার হিটলারকে ঝাঁটা মারে আমি তোকে কখনো বলেছি ?

স্মার্টি। না। [ঝাঁটা মারার কথায় মজা পেয়ে] কবার মারে ?

স্কোরেপা। দুবার। সকালে একবার, বিকেলে একবার। দুবার ঘর ঝাঁট দেয়, দুবার ঝাঁটা মারে।

স্মার্টি। তোর বউটা বেশ—। আমার বউটা—

স্কোরেপা। চুপ। আবার বউ !

[স্মার্টি আবার নিজের মুখ চেপে ধরে।]

শালা নাচ-গান কেমন দেখলি সেই সব বল্‌না।

স্মার্টি। আচ্ছা স্কোরেপা, কমুনিস্টদের সৈন্যবাহিনীতে কি গানও শেখায় ?

স্কোরেপা। হতে পারে। কতো রকম বৃদ্ধ আছে।

[ওদের কয়েদি এসে আগেই স্ট্রেচারে শুয়ে ছিলো।]

নে, তোল্।

[ওরা চলে গেল।]

ফুচিক। ক্রেমলিনের ঘড়িতে এখন দশটা বাজে। রেড স্কোয়ারে নিশ্চয়ই প্যারেড হচ্ছে। তবে আমরা কেন নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করবো? পৃথিবীতে যারা মানবমুক্তির গান গায়, আমরা তো তাদেরই দলে।

[ফুচিক, পেসেক ও কারেক আস্তে আস্তে ইন্টারন্যাশনাল গাইতে শুরু করেন। কোলিনস্কি টহল দিতে দিতে একবার ফুচিকের কাছ থেকে তাঁর লেখা কাগজগুলো সরিয়ে ফেলল আবার কিছুক্ষণ বাদে এক ফাঁকে নতুন কাগজ তাঁর হাতে দিল। ঢুকল সপ্‌পা। সঙ্গে স্ট্রেচার নিয়ে স্কোরেপা ও স্মার্টি। সপ্‌পার হাতে একটা ফাইল।]

সপ্‌পা। দর্‌ওয়াজা খোল্।

[কোলিনস্কি দরজা খুলে দিল।]

পেসেক। তৈয়ার। ২৬৭ নম্বর সেল। তিনজন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।

[ওরা চার জন সেলের ভেতরে ঢুকল।]

সপ্‌পা। [ফাইল দেখে] কারেক মালেৎস্।

[পেসেক অশুভ আশঙ্কায় কারেককে জড়িয়ে ধরলেন।]

কারেক। হাজির।

সপ্‌পা। আগে হুড্‌লিংসে লোহার খনিতে মিস্ত্রির কাজ করতে?

কারেক। হাঁ।

সপ্‌পা। [ফাইল দেখে] গোপন যুদ্ধের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ সরিয়েছিলে, রাইখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ইত্যাদি ইত্যাদি অভিযোগে দু বছর আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলে। বার্লিন যাবার হুকুম হয়েছে। সেখানে বিচার হবে। তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

কারেক। [নিঃশব্দে তার পাৎলুন ও জামাটা নিয়ে নিল। তারপর ফুচিকের কাছে এসে দাঁড়াল] কমরেড, বার্লিন যাচ্ছি। বিচার হবে।

ফুচিক। নির্ভয়ে যাও কমরেড। আজ হোক কাল হোক ইতিহাসের কাঠগড়ায় আমাদের সবাইকেই একদিন দাঁড়াতে হবে।

কারেক। [ফুচিককে চুমু খেল এবং পেসেকের কাছে গিয়ে] বাবা।

পেসেক। [ধরা গলায়] সেলের দরজায় আজ থেকে দু জনের নাম থাকবে, তিনজনের বদলে। আমাকে তবু বলতেই হবে, ২৬৭ নম্বর সেল। দুজন কয়েদি। সব ঠিক হ্যায়।

[কারেক নীচু হয়ে পেসেকের মাথা দুহাতে চেপে ধরে চুমু খেল।]

সপ্‌পা। [চিৎকার করে] প্যানক্র্যাট্‌স জেলখানায় উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। জলদি।

[সপ্‌পা গটগট করে বাইরে বেরিয়ে এল। স্কোরেপা ও স্মার্টি কারেককে

স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল।
কোলিনস্কি দরজা বন্ধ করে দিল।
পেসেক ও ফুচিক গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে।
তাঁদের চোখে জল। কারেক শুয়ে শুয়ে
হাত মুঠো করে লাল সেলাম জানাল।
পেসেক আর ফুচিকও হাত তুললেন।
ওরা চলে যাবার পর ফুচিকরা আবার
গান ধরলেন।

গান :

হে কারাগারের বন্দী সাথীরা,
উদ্ধত দেয়ালের আড়ালে তোমরা,
তবু তো তোমরা আমাদেরই—
আমাদেরই।

হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে ঢুকল
স্মেতোনুঝ। তাকে রীতিমত উদ্বিগ্ন
মনে হচ্ছে। ফুচিকদের কাছে গিয়ে।]

স্মেতোনুঝ। যুদ্ধের খবর শুনেছো? [কাগজ দেখিয়ে] এতে আছে। জানো, আমি কিন্তু কোনোদিনই যুদ্ধ চাই নি। জাতির সম্মান! হিটলারের মর্যাদা! চুলোয় যাক সব। ওরা নিরাপদে শুয়ে শুয়ে হুকুম চালাবেন আর সীমান্তে মরবো আমরা। আমাদের রক্ত যে সস্তা। আচ্ছা কোন্ পক্ষ জিতবে বলো তো? আমাদের কি হবে? নিকেশ হয়ে যাবো, না? আমি কিন্তু শালা উল্টোটাই ভেবেছিলাম। ভয় করছে জানো! ন্যাশ্নাল্ সোস্যালিজম্! শালা সব ঝুটা হ্যায়! আমার কি মনে হয় জানো, একদিক থেকে তোমাদের আর আমাদের অবস্থা একই। তাই তোমাদের

ভরসা করে দুটো কথা বলা যায়। [কোলিন্‌স্কিকে দেখিয়ে চুপিচুপি] ও শালা আবার না শুনে ফেলে। আমার মনে হয়, আমরা বোধহয় জিততে পারবো না। জার্মানরা বোধহয় স্তালিনগ্রাদে হারছে।

[সঙ্গে সঙ্গে দূরে শেল ফাটার শব্দ। বোমারু বিমান উড়ে যাবার শব্দ। আর্তনাদ। সৈন্যরা প্যারেড করে এগিয়ে যাচ্ছে।]

ফুচিক। [সেল থেকে বেরিয়ে এসে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে] পূর্ব প্রুশিয়ার লিথুয়ানিয়া সীমান্তের বাসিন্দা ওই স্মোভোন্‌স্কের গলায় ইতিহাসের নির্ভুল ইঙ্গিত, জিততে ফ্যাসিস্ট হিটলার পারে নি। ১৯৪৫-এর মে মাসে জার্মানির পরাজয় হলো। আর যে সব বন্দীদের ফ্যাসিস্টরা তখনো মেরে ফেলতে পারে নি, তাঁরা মুক্তি পেলেন। যে যার দেশে ফিরলেন।

[মঞ্চ অন্ধকার। কিন্তু একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ধরে অগাস্তিনা ফুচিককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাঁর পোষাক ছেঁড়া। যেন বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে তিনি আসছেন। পিঠে হ্যাভারস্যাক। অগাস্তিনা এসে দাঁড়ালেন।]

অগাস্তিনা। আমিও তাদের একজন। অগাস্তিনা ফুচিক। [পিঠের ব্যাগ নামিয়ে পথের ওপর বসে পড়লেন] আমি ছিলাম রাভেন্‌সব্রুকের বন্দীশালায়। সেখানেই আমি শুনেছি, উনিশ শ তেতাল্লিশ সালের পঁচিশে আগস্ট বার্লিনের এক

নাৎসী আদালতে আমার স্বামী জুলিয়াস ফুচিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে আর আটই সেপ্টেম্বর, আদেশের চৌদ্দ দিন পরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ-ও শুনেছি, প্যানক্রাট্স্ বন্দীশালায় থাকার সময় উনি কিছু লিখে রেখে গেছেন। এ্যাড্‌লফ্ কোলিন্‌স্কি নামে একজন মহানুভব চেক রক্ষীর কাছে তা আছে। যুদ্ধ থেমে গেছে। মুক্ত স্বদেশে ফিরে এসে আমি সেই রক্ষীটিকেই খুঁজছি।

[আর একটি আলোর পথ ধরে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন কোলিনস্কি। তাঁর পরণে সাধারণ চেক নাগরিকের পোষাক।]

কোলিন্‌স্কি। আমিই এ্যাড্‌লফ্ কোলিন্‌স্কি।

[অগাস্তিনা স্থির দৃষ্টিতে কোলিন্‌স্কির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। কোলিন্‌স্কি ফুচিকের পাণ্ডুলিপির একতাড়া কাগজ তার ব্যাগ থেকে বের করে অগাস্তিনার দিকে এগিয়ে দিলেন।]

কমরেড জুলিয়াস ফুচিকের জীবনের সৃষ্টির শেষ অধ্যায়। আপনার হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলাম।

অগাস্তিনা। [সাগ্রহে কাগজগুলো হাত পেতে নিলেন। গভীর আবেগে সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন। কিছুক্ষণ বুকের ওপর চেপে ধরে চোখ বুজে রইলেন। তারপর চোখ মেলে বললেন] আমাকে লিখেছিলেন, মৃত্যুর হাত থেকে চুরি-করে-আনা সময়টাতে আমি লিখছি। সেই লেখা যে তোমাদের

হাতে পৌঁছে দেবে, সে ছিলো বলেই মৃত্যু আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি।

[কোলিনস্কি চোখ রুমাল দিয়ে ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছেন।]

লিখেছিলেন, আর কোন খেদ নেই আমার। আমি লড়েছি জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে। হাসিমুখে লড়েছি।

[এবার কোলিনস্কির কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।]

আপনিও কাঁদছেন কমরেড কোলিনস্কি? আপনি যে বীর। আমার স্বামী বলতেন, পৃথিবীর সুখের জন্যে আমাদের বেঁচে থাকা, লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া, তার জন্যেই হয় আমাদের মৃত্যু। আমাদের নামের সঙ্গে তাই দুঃখ যেন না জড়িয়ে থাকে। দুঃখ নয় কমরেড, জুলিয়াস ফুচিক আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন এই পৃথিবীকে আর দিয়ে গেছেন এক লড়াইয়ের যোগ্য উত্তরাধিকার।

[মঞ্চের সমস্ত আলো জ্বলে উঠল। মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন ফুচিক। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও সকলে মঞ্চে প্রবেশ করল।]

ফুচিক্। প্যাক্ আপ্। জুলিয়াস ফুচিক বলতেন, [দর্শকদের দিকে আঙুল দেখিয়ে] হুঁসিয়ার, এখানে কেউ দর্শক নেই। সবাই তোমরা অংশগ্রহণ করছো। জার্মান কন্‌সেনট্রেশন্ ক্যাম্পের মধ্যে সেদিন চেকোস্লোভাকিয়ার সাচ্চা মানুষগুলো যখন মরছিলেন, বাইরে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে,

খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, প্রেম করছে। কোনো সমস্যার সঙ্গে তাদের যেন কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা হতেই পারে না। তাদের মনেও আলোড়ন উঠেছিলো কিন্তু তারা মুখ বুজে সহ্য করেছে। শুধু ফুচিকদেরই কবরখানার ওপর অমূল্য জীবনের মহামূল্য বীজ পোঁতা হলো। বীজ হলো অঙ্কুর। আর সেই অঙ্কুরই একদিন নতুন জীবন হয়ে দেখা দিলো আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর শ্যামল উদ্যানে। ভুলে গেলে চলবে না, হিটলারের হাতে মানব জাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখা হতো। তাই আজ যারা নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দেবেন, ফুচিকের লড়াইয়ের উত্তরাধিকার মেনে নিতে তারা বাধ্য।

[সকলে একসঙ্গে গান ধরলেন।

গান

'হে কারাগারের বন্দী সাথীরা,
উদ্ধত দেয়ালের আড়ালে তোমরা,
তবু তো তোমরা আমাদেরই, আমাদেরই।
আমাদের যাত্রাপথে চলার তালে তালে
পা পড়ছে না তোমাদের,
তবু তো তোমরা আমাদেরই।'

যবনিকা